চিন্তাপ্রবাহিণী।

প্রথম ভাগ।

শ্রীপ্রিয়নাথ দাস কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতায়
সংস্কৃত যন্ত্রে
মুদ্রিত।

সন ১২৯৪।

উপহার।

দর্শনশাস্ত্রাভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ
পাল অগ্রজ মহাশয় সমীপে

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনম্

আমি যদি এই ক্ষুদ্র পুস্তকে কিছু মাত্র চিন্তাশক্তির পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তাহার মূল কারণ আপনি। ইহা সারগর্ভ বা আপনার পাঠযোগ্য না হইলেও স্নেহপাত্রলিখিত বলিয়া অবশ্য আপনার আদরের বস্তু হইবে, এই আশায় সাহসী হইয়া আমি ইহা আপনার কর-কমলে অর্পণ করিলাম ইতি।

প্রণত

শ্রী—

চিন্তাপ্রবাহিণী।

প্রেমবিষয়ক প্রথম পত্র।

ভাই প্রমদাচরণ! তুমি এক দিন আমাকে বলিয়াছিলে, ভাই সরোজ! আমি অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, জ্ঞানই মনের আলোক, মনের আলোকই মনের সুখ, অজ্ঞানই মনের অন্ধকার, এবং মনের অন্ধকারই মনের দুঃখ। ভাই! মন যাহাতে আলোকিত না হয় তাহা অবশ্য বর্জ্জন করিও এবং যাহাতে মন আলোকিত হয় তাহা অবশ্য পালন করিও।'

তোমার এই কথিত জ্ঞান আমি প্রথমে বিশ্বাস করি নাই, তার পরে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া বিশ্বাস করিয়াছি। আমি প্রথমে তোমার কথিত জ্ঞান স্বাধীন ভাবে চিন্তা না করিয়া বিশ্বাস করি নাই বলিয়া তুমি দুঃখিত হইবে না, বরং অতি সুখী হইবে। কারণ তুমি এক দিন তোমার কোন বন্ধুর নিকট বলিতেছিলে "জ্ঞান কাহারও একচেটিয়া নয়, উহাতে সকলের অধিকার আছে যিনি স্বাধীন ভাবে জ্ঞান লইবেন, উহা তাঁহারি হইবে। স্বাধীন ভাবে চিন্তা না করিয়া যিনি পরের কথায় বিশ্বাস করিয়া জ্ঞান লইতে চান, তিনি উহা লইতে পারেন না। যিনি পরের

কথায় বিশ্বাস করেন, তিনি পরমতাবলম্বী। যিনি পরমতাবলম্বী তিনি মনোজগতের নিয়মানুসারে জ্ঞান গ্রহণ করিতে পারেন না। যিনি পরকথিত জ্ঞানকে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া গ্রহণ করেন, তিনি মনোজগতের নিয়মানুসারে জ্ঞান গ্রহণ করিতে পারেন, এবং তিনি স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া জ্ঞান গ্রহণ করেন বলিয়া স্বাধীনমতাবলম্বী, কারণ তিনি পরের কথায় বিশ্বাস না করিয়া স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া লইয়াছেন।'

ভাই। তুমি আমার কাছেও সহস্র সহস্র বার বলিয়াছ "পরমতাবলম্বী হইও না, পরমতাবলম্বী হইলে স্বাধীন চিন্তা লুপ্ত হয়, স্বাধীন চিন্তাই আত্মার চিন্তা, সুতরাং স্বাধীন চিন্তা লোপ পাইলে আত্মাও লোপ পাইবে না কেন? স্বাধীন চিন্তাই আনন্দভোগের এবং আত্মবিকাশের একমাত্র উপায়।'

আরও তুমি বলিয়াছিলে "যদি তুমি জগতের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হও, তাহা হইলে জগতের স্বাধীন চিন্তার প্রতিবন্ধকগুলি প্রাণপণে তাড়াইবার চেষ্টা কর এবং চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইয়া স্বাধীন চিন্তার স্রোত খুলিয়া দেও, দেখিবে জগৎ আনন্দস্রোতে ভাসিতেছে। ভাই। কদাচ কাহাকেও আপনমতাবলম্বী করিও না।' তজ্জন্য আমার বিশ্বাস আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি নাই এবং উহা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়াছি বলিয়া তুমি অতি সুখী হইবে।

সে যাহা হউক এক্ষণে আমি তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। আমার প্রশ্নবিষয়টী পুরাতন, তাহা পথে ঘাটে, বিপিনে, বেশ্যাগৃহে ইত্যাদি স্থানে এবং প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, সন্ধ্যায়, নিশীথে, ইত্যাদি সর্ব্ব সময়ে,

কবির কাব্যে, যুবক যুবতীর আলাপনে, বালকের ক্রীড়ায় ইত্যাদি সর্ব্বকার্য্যে তাহা আলোচিত হইতেছে। উহা পুরাতন হইলেও উহাকে সকলে পাইবার জন্য লালায়িত, সকলের চক্ষে উহা চিরনূতন এবং এক অপূর্ব্ব সুখদায়ক পদার্থ, ঐ পদার্থের নাম ভালবাসা। উহা কিপ্রকার? সহজাত কি পরের নিকট শিক্ষণীয়? উহা কি কি প্রকারে উদ্রিক্ত হয় ইত্যাদি বিষয় তোমার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি ইতি। ১২৯২ সাল। ৩ই ফাল্গুন।

তোমার
শ্রীসরোজকুমার সেন।

তদুত্তর।

ভাই সরোজ! তোমার পত্র আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া অতি আনন্দিত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার পত্রের উত্তর দিতে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলাম।

প্রথম কথা—ভালবাসার স্থান কোথায়?

যখন আমাদের ভালবাসার উদ্রেক হয়, তখন আমাদের মস্তিষ্ক ও বক্ষের ভিতর আলোকিত হয়। আমি এক দিন এক খানি উপনিষদের একটী শ্লোকের বঙ্গানুবাদ দেখিয়াছিলাম 'একটী বৃক্ষ রহিয়াছে, তাহাতে দুইটী পক্ষী থাকে; একটী উচ্চশাখায়, আর একটী নিম্নে। উচ্চশাখায় যে পক্ষীটী রহিয়াছে, সে আনন্দে ফলাহরণ করিয়া নীচেরটীকে দিতেছে; উহা নীচেরটী আহ্লাদিত হইয়া ভক্ষণ করিতেছে। উপরে-

বটী কার্য্যে বিরত, আর নীচেরটী নিশ্চেষ্ট।” আমার জ্ঞানেও উহাই মন প্রাণ, উচ্চেরটী অর্থাৎ মস্তিষ্কের ভিতরটী মন, আর নীচেরটী অর্থাৎ বক্ষের ভিতরটী প্রাণ, মন কার্য্যে বিরত, কার্য্যের ফলাহরণ করিয়া নিশ্চেষ্ট প্রাণকে দেয় প্রাণ তাহা খাইয়া ফলানুসারে দুঃখ কিম্বা সুখ পাইয়া থাকে। ভালবাসা ঐ দুই স্থানে আলোকিত হয়। উহাদের পরস্পর গাঢ় প্রেম আছে, সুতরাং উহারা অভিন্ন এবং উভয়ে এক ধর্ম্মাবলম্বী, এক-ধর্ম্মাবলম্বী না হইলে উহাদের প্রেম হইত না, সুতরাং ভালবাসা পদার্থ উহাদের উভয়েরই আছে। উহারা (মন প্রাণ) যে ভালবাসা নয় তাহা বা কি করিয়া বলি, কারণ যখন উহাদিগকে আলোকিত হইতে দেখি তখন দেখিতে পাই উহারা স্বাভাবিক রূপে উদিত হইয়াছে এবং উহাদের স্বাভাবিক শরীরের শত্রু পাপ মলিনতা দূর হইয়া গিয়াছে।

যখন অশিক্ষিত শিশুও চাঁদ শিশু প্রভৃতি সুন্দর ও সমধর্ম্মী পদার্থকে ভাল বাসে, তখন কি করিয়া বলিব, উহা শিক্ষণীয় বৃত্তি সহজাত নয়? কেহ কেহ বলিতে পারেন, বাহ্যিক জগৎ হইতে সুন্দরতা আসিয়া শিশুর মনে ভালবাসা ভাব ঘটাইয়া দিয়া থাকে, নচেৎ ভালবাসা বলিয়া আন্তরিক কোন পদার্থ নাই। তাঁহাদের প্রশ্নের এই উত্তর বলিলে যথেষ্ট হইবে যে আমাদের চক্ষু আছে বলিয়া আমরা দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য করিয়া থাকি যাঁহাদের চক্ষু নাই তাঁহারা কি দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে পারেন? যেমন অন্ধব্যক্তি দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে পারে না সেই প্রকার শিশুদের যদি সুন্দর প্রণয়বৃত্তি অন্তরে না থাকিত তাহা হইলে কখন তাহারা প্রণয়লিপ্সায় জগতে সমধর্ম্মী সুন্দ

পদার্থ খুজিয়া বেড়াইত না এবং পাইয়া আনন্দ লাভ করিত না। তাহাদের প্রাণ সেই সময় সুন্দর থাকে বলিয়া এবং তাহাদের প্রাণের ধর্ম্ম প্রণয় বলিয়া তাঁহারা চাঁদ, আলোক, শিশু প্রভৃতি সুন্দর ও সমধর্ম্মী পদার্থের সহিত প্রণয় করে। দেখ যখন তাহাদের সে বৃত্তি কালক্রমে কোন কারণে ঢাকা পড়িয়া যায়, তখন জগতে সেই সমস্ত সুন্দর ও সমধর্ম্মী পদার্থ থাকা সত্ত্বেও সেই সমস্ত পদার্থের সমধর্ম্ম ও সুন্দরতা তাহারা অনুভব করিতে পারে না, সুতরাং দেখিয়াও দেখে না ও প্রণয় করে না কারণ ঐক্ষণে তাহাদের অন্যভাবের প্রাবল্য হয় এবং [illegible] প্রাবল্যানুসারে পদার্থ দর্শন করিয়া প্রণয় করিয়া থাকে।

প্রত্যক্ষ ঘটনা দেখাইলাম। ইহার উপর যে তর্ক করে, সে সত্যধ্বংসী মহাপাপী। সে মহাপাপী আকাশে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে চায়, কিন্তু সত্যবলে বলীয়ানের নিকট পরাস্ত হইয়া পলাইয়া যায়। ভাই! মিথ্যা দুর্ব্বল, সত্য শক্তিস্বরূপ। সত্যধ্বংসী মহাপাপীকেও সত্যধ্বংসের অভিপ্রায়ে বিভিন্ন সত্যের আশ্রয় লইয়া বলীয়ান্ হইতে হয়, অর্থাৎ যে সমস্ত সত্যের সহিত বচার্য্য সত্যের কোন সামঞ্জস্য থাকে না, তাহার আশ্রয় লইতে হয়, কিন্তু সত্যবলে বলীয়ানের নিকট জাল ছিন্ন হইলে পলাইয়া যায়।

ভালবাসা [illegible], সুন্দর, উজ্জ্বল, পবিত্র ও মহৎ। অন্যকে আপনার মত দেখিয়া বা অনুভব করিয়া সুতরাং অন্যকে আপন করিবা অন্যের উপকার কর উহার ধর্ম্ম বলিয়া উহা স্বচ্ছ, সুন্দর, উজ্জ্বল, পবিত্র ও মহৎ।

ইহার আর একটী প্রধান ধর্ম্ম অস্পষ্ট রূপে উক্ত হইয়াছে এই যে, উহা আপন সমধর্ম্মী না হইলে মিশে না, এবং সমধর্ম্মী না দেখিলে অজ্ঞানাচ্ছন্নতা দূর করিয়া মিশিতে যায় না।

নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকারে ভালবাসা উদ্রিক্ত হইয়া থাকে।

১। সমধর্ম্মোত্থিত। তুমি যদি পরোপকারী, সত্যবাদী, স্বাধীনচেতা প্রভৃতি হও, তাহা হইলে অন্য এক জনকে পরোপকারী, সত্যবাদী, স্বাধীনচেতা প্রভৃতি দেখিলে তোমার ভালবাসার উদ্রেক হইবে। ঐ ভালবাসাই সমধর্ম্মোত্থিত।

২। রূপোত্থিত। ভালবাসা সুন্দর, উহা অপরকে আপনার মত সুন্দর দেখিলে ভালবাসে, সুতরাং রূপ দেখিয়া ভালবাসার উদ্রেক হয়। কারণ রূপ সুন্দর। পূর্ব্বে ইহাও বলা হইয়াছে উহা সমধর্ম্মী না হইলে ভাল বাসে না। এই কারণে এক জনের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার আন্তরিক সৌন্দর্য্য সজীব পদার্থ অনুমান করিয়া তবে প্রকৃত ভালবাসে। কারণ ইনি স্বয়ং আন্তরিক সজীব সুন্দর পদার্থ, সুতরাং সমধর্ম্মী না দেখিলে ভালবাসেন না। এই কারণে ভালবাসা কুৎসিত ব্যক্তিরও আন্তরিক সৌন্দর্য্য দেখিলে আপনার অংশ ভাবিয়া ভালবাসে। এই কারণে যুবতীর বাহ্যিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া যুবক স্বীয়মন-হৃদয়ের প্রেম যুবতীর আন্তরিক সজীব সুন্দর পদার্থ অনুমান করিয়া তাহাকে ভালবাসে, কিন্তু যখন সে সুন্দরী যুবতীর আন্তরিক কুৎসিত রূপ দেখে, তখন যুবকের ভালবাসা অন্তর্হিত হইয়া যায়, কারণ যুবকের ভালবাসা আন্তরিক সজীব সুন্দর পদার্থ, যুবতীর রূপ বাহ্যিক নির্জ্জীব, তাহা অন্তরিক সজীব সুন্দর পদার্থ নয়। তাই। যাহারা বাহ্যিক রূপ দেখিয়া আন্তরিক সজীব পদার্থের রূপ অনুমান

করিয়া প্রথমে ভালবাসে, শেষে তাহাদিগকে প্রায় কাঁদিতে হয়। যদি ভালবাসার ধর্ম্ম চরিতার্থ করিতে চাও, আন্তরিক রূপ দেখিয়া ভালবাস অথবা অন্যের আন্তরিক সজীব পদার্থের রূপের বিকাশ করিতে চেষ্টা কর, চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই, সফলকাম হইবে, তোমার ভালবাসা বৃত্তি অন্যান্যের অন্তরের মঙ্গলা-নিবারণের আরম্ভ কার্য্য হইতে শেষ কার্য্য পর্য্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিতে থাকিবে। আরম্ভ কার্য্য হইতে শেষ পর্য্যন্ত তোমার মনে কার্য্যানুসারে স্বর্গরাজ্য বিস্তার হইতে থাকিবে।

৩। গুণোত্থিত। গুণ যাহা তাহাই আন্তরিক সজীব পদার্থের রূপাদি, সুতরাং প্রেম-ধর্ম্মানুসারে গুণ দেখিয়া ভালবাসার উদ্রেক হইয়া থাকে। যত দিন গুণ থাকে তত দিন গুণজাত ভালবাসা থাকে, গুণ অদৃশ্য হইলে উহা তৎসঙ্গে চলিয়া যায়। তুমি আমার স্বার্থের জন্য নিজের স্বার্থ বলি দিতেছ দেখিয়া যে ভালবাসার উদ্রেক হয়, তাহাই গুণোত্থিত।

৪। জ্ঞানোত্থিত। চিন্তা দ্বারা যখন আমরা জানিতে পারি, আমরা যতপ্রকার জীব এই জগতে বাস করি, সকলেই এক প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। প্রকৃতির যে যে উপাদানে তরঙ্গিণী বা সুরেন্দ্র নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই সেই উপাদানে মিসেস মেরি বা মিশ্ গর্ডন্ নির্ম্মিত হইয়াছে। তবে দেশানুসারে ভৌতিক উপাদানের পরিমাণ কম বা বেশী হইতে পারে মাত্র। আর তরঙ্গিণী বা সুরেন্দ্র, মিশেশ মেরি বা মিশ গর্ডন যে যে ভৌতিক উপাদানগুলির যেরূপ মাত্রার সংযোগের ফলে নির্ম্মিত হইয়াছে, আবার সেই সেই ভৌতিক উপাদান সেইরূপ নিয়মে সংযোগ না হইয়া বিভিন্ন মাত্রায় সংযুক্ত হইয়া

মানব ব্যতীত অন্যান্য জীব সৃষ্ট হইতেছে। এইরূপে প্রকৃতির ভৌতিক উপাদানগুলিতে জগতের সমস্ত পদার্থ নির্ম্মিত হইতেছে, এবং তাহা সংযোগহীন হইয়া পুনর্ব্বার স্ব স্ব স্থানে আসিতেছে, অর্থাৎ তেজে তেজ, জলে জল ইত্যাদি ভূতে ভূত মিশিতেছে। এই জ্ঞানে অর্থাৎ ভৌতিক মাত্রার কম বা বেশী কারণে বাহিকে কতক ভিন্ন হইলে মূলে আমরা সব এক প্রকৃতির সন্তান জানিয়া যে প্রেমের উদ্রেক হয়, তাহাকে জ্ঞানোদিত ভালবাসা বলে। এই ভালবাসা স্থায়ী, ইহাই বিশ্বপ্রেম। ভালবাসার পাত্রেরা যদি অজ্ঞানবশতঃ বিশ্বপ্রেমিকের উপর অসংখ্য অত্যাচার করে, তথাচ বিশ্বপ্রেমিক মনে করেন "উহাদের শরীরে এমন একটী পদার্থ আছে যিনি আমারই মত, যিনি আমারই আত্মার অংশ, যিনি বিশ্বপোষক, সুন্দর, পবিত্র, শান্তিময় ইত্যাদি, তিনিই ইহাদের শরীরের প্রভু। যে অজ্ঞান আমার ও ইহাদের অন্তরের উপর অত্যাচার করিতেছে, সে অজ্ঞান উহাদের আত্মা নয়, বন্ধু নয়, শত্রু। ঐ শত্রুর বশবর্ত্তী হইয়া আমার উপর অত্যাচার করিতেছে ভাবিয়া এক সময়ে উহারা আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইবে।

ভাই! দেখ জ্ঞানীর আরাধ্যদের বিশ্বপ্রেমিক মহাত্মা যীশুকে ইহুদিরা যখন ক্রুশে বিদ্ধ করিবার জন্য লইয়া গিয়াছিল, তখন তিনি ঐ কথা ভাবিয়াছিলেন না? মহাত্মা চৈতন্যকে যখন জগাই মাধাই মারিয়াছিল, তখন তিনি ঐ কথা ভাবিয়াছিলেন না? সত্য সত্যই যীশুশত্রুদিগের ও জগাই মাধারের মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে এক সুন্দর পদার্থ ছিল না? এবং তাহারা শেষে আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়াছিল না, খৃষ্ট-শত্রু ও জগাই মাধাই উভয়ের

ঘটনায় দেখিতে চেষ্টা কর, আমার ঐ কথিত জ্ঞান দেখিতে পাইবে। যীশু ও চৈতন্যের নিকট প্রমাণ হইল জ্ঞানোদিত ভালবাসা ভালবাসার পাত্রদিগের গুণ না দেখিলেও গুণ আছে জানিয়া ভঙ্গ হয না, এবং ভালবাসার পাত্রদিগের গুণ আছে বলিযা যে তাঁহারা বিশ্বাস করেন তাহা যে সম্পূর্ণ সত্য বিশ্বপ্রেমিকেরা জগতে সর্ব্বক্ষণ তাহা দেখাইতেছেন। তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, জ্ঞানোদিত ভালবাসা সর্পকে হৃদযে স্থাপন করিবে কি না? এবং প্রাণনাশক ভৌতিক পদার্থগুলিকে সাদরে গ্রহণ করিবে কি না? কেন করিবে না, তাঁহারাও ত প্রকৃতি-জননীর পুত্র, বা প্রকৃতি-জননীর অংশ।

ভাই। অহংকার করিয়া বলিতে পারি, ভালবাসা নির্দ্দোষ পদার্থ। ইহা নির্দ্দোষ কি না জ্ঞানোদিত ভালবাসার নিযম বলিয়া দিলে বুঝিতে পারিবে।

জ্ঞানোদিত ভালবাসার নিয়ম এই "আমরা সব এক প্রকৃতির সন্তান, সুতরাং আমরা এক. আমরা যেখানে সব এক হইলাম, সুতরাং আমাদের পরস্পর মঙ্গলচেষ্টা ধর্ম্ম হইযা উঠিল। মঙ্গলচেষ্টা কি? দোষমুক্ত করা, সুতরাং আমাদের যাহা দোষ তাহাকে ধ্বংস করাই জ্ঞানোদিত ভালবাসার ধর্ম্ম। জ্ঞানোদিত বিশ্বভালবাসা বলিলে বিশ্বের দোষকে ভালবাসিতে পারা যায না, অথচ তাহাকে শত্রু জ্ঞান করিযা দূরীকরণ করাই উক্ত ভালবাসার ধর্ম্ম বুঝিতে হয, সুতরাং বিশ্বভালবাসা বলিলে বিশ্বের দোষকে ভালবাসিতেও হইবে ইহা বুঝা ভ্রম। ভালবাসা যেখানে বহিয়াছে, সেখানে দোষকে ভালবাসা যায না, কারণ ভালবাসার ধর্ম্ম দোষ ধ্বংস করা, সুতরাং জ্ঞানোদিত

বিশ্বভালবাসা বলিলে বিশ্বের দোষ-নিবারণের উদ্দেশ্য বুঝিতে হয়, দোষকে ভালবাসা বুঝিতে পারা যায় না; কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে. ভালবাসার অপর নাম দোষশত্রু। দোষশত্রুকে দোষমিত্র বুঝা মহাভ্রম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভালবাসা সুন্দর, আপন সমধর্ম্মী সুন্দর পদার্থ ভিন্ন অন্য কু পদার্থের সহিত প্রাণান্তেও মিলিত হয় না। ভালবাসার সাধারণ এই ধর্ম্ম থাকিবার জন্য জ্ঞানোদিত বিশ্বভালবাসাও বিশ্বের মন্দ পদার্থকে প্রাণান্তেও ভাল বাসিবে না, অথচ শত্রু জ্ঞান করিয়া তাহার ধ্বংস করিবার চেষ্টাই তাহার ধর্ম্ম. সুতরাং জ্ঞানোদিত ভালবাসায় বিশ্বের দোষকে ভালবাসার নিয়ম নাই।

আমরা সব এক প্রকৃতির সন্তান জানিলে একভাবের শত্রু অজ্ঞানতা মন হইতে যাইয়া বিশ্বভালবাসার উদয় হইলে আমাদের মন ও প্রাণ অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হয়। তবে বিশ্বভালবাসা প্রাণ ও মন না হইবে কেন?

ঐ প্রাণ বা বিশ্বপ্রেম সুন্দর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভালবাসার ধর্ম্ম আপন সমধর্ম্মীর সহিত মিলন করা, এবং বিধর্ম্মীপদার্থকে নাশ করা, সুতরাং "ভ্রমজ্ঞান" যদি অনিষ্টকর পদার্থকেও এক প্রকৃতির সন্তান বলিয়া কু পদার্থকে ভালবাসা জন্মাইয়া দিতে চায়, তথাচ ভালবাসা উক্ত-ধর্ম্মানুসারে কখনই কুপদার্থকে গ্রহণ করিবে না, এবং উপকার-ধর্ম্ম বিকাশও করিবে না; "কু জ্ঞান" ঘোরে তাহা মরিয়া যাইবে। কুপদার্থ যে বিশ্বভালবাসার বা ভালবাসার আপনার পদার্থ নয় এই ঘটনায় বিবেচনা কর এবং সুপদার্থ যে ভালবাসা পদার্থ এই ঘটনায় ইহাও বিবেচনা কর। অজ্ঞানে জ্ঞানোদিত ভালবাসার উদ্রেক হয় না, যে

জ্ঞান উদ্রেক হয়, তাহাকে জ্ঞানোদিত ভালবাসা বলিয়াছি। বাদরায়ণ প্রভৃতি মহাত্মাদের ভালবাসাকে আমি জ্ঞানোদিত বিশ্বভালবাসা বলিয়াছি।

৫। স্বতঃসিদ্ধ। আর একটী ভালবাসা রহিয়াছে, তাঁহাকে নিষ্কারণোদ্রিক্ত ভালবাসার মত বোধ হয়। বাহিক দৃষ্টিতে ঐ ভালবাসা যেন রূপ, গুণ বা সকলকে আপন জানিয়া উৎপন্ন হয় না। সকলপ্রকার স্বার্থের উপর এই প্রেমটীর ভয়ানক দ্বেষ।

এই প্রেমটী ভাবেন, এক জনের রূপ বা গুণ আছে বলিয়া বা সকলে আপনার বলিয়া ভালবাসিব, নচেৎ ভাল বাসিব না? রূপ, গুণ থাক্ বা না-থাক্ অবশ্য ভালবাসিব; রূপ, গুণ ও সকলকে আপন দেখিয়া যদি ভালবাসি, তাহা হইলে ঘৃণিত স্বার্থের বশীভূত হইব, এই জন্য ইহা নিঃস্বার্থ হইয়া ভালবাসে। এই প্রেমটী মানসিক সত্যের (আলোকের) ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং উহা মানসিক-সত্যপ্রিয়। যাহাতে মানসিক সত্যের বিঘ্ন হয়, তাহারই উপর উহার ভয়ানক দ্বেষ। মানসিক-সত্য-প্রিয়তার কারণে উহার "সকলে এক" জ্ঞানটী বড় প্রবল, কারণ "এক জ্ঞান" মানসিক সত্যের (আলোকের) প্রধান কারণ। "সকলে এক" জ্ঞানের বিরুদ্ধে যদি কেহ কিছু বলেন, এই ভালবাসা বড় ব্যথা পায়, এবং বহু চিন্তা করিয়া বহু-চিন্তা-জনিত আয়াস করিয়া "আমরা সকলে এক" ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পায়। যদি কেহ কূটতর্কে প্রতিপন্ন করিতে বসেন "জীব বিভিন্ন"। ঐ প্রেম তর্কে পরাভূত হইলেও ভাবেন সত্য হউক বা মিথ্যা হউক তাহা আমার জানিবার প্রয়োজন নাই। যাহা মানসিক অসত্য

(অন্ধকার) তাহাকে অসত্য ভাবিব এবং যাহা মানসিক সত্য (আলোক) তাহাকে সত্য ভাবিব। "জীব এক" ভাব না ভাবিলে আমার মন ও হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, সুতরাং "জীব বিভিন্ন" ভাব ভাবিব না।

বারংবার বক্তব্য বলিয়া উক্ত হইতেছে, ভালবাসা সুন্দর পদার্থ, উহা সমধর্ম্মী না হইলে ভালবাসে না, ইত্যাদি ভালবাসার যে ধর্ম্ম পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইহাঁর ভালবাসা নাম হইয়া সেই সমস্ত ধর্ম্মে বঞ্চিত হইবেন কেন? রক্ষিত না হইবার কারণে এই ভালবাসাও "কু" কে দেখিতে পারে না, "কু" ধ্বংস করিবার চেষ্টা পায়, ও আপন সমান না হইলে মিশে না, সুতরাং আমি এই ভালবাসাকে অপ্রকাশিত-জ্ঞানোত্থিত ভালবাসা বলিতে পারি। এ প্রেমটীও যে "অপ্রকাশিত-জ্ঞানোত্থিত" প্রেম, তাহার কোন সন্দেহ নাই। দেখ ভাই। যেখানে ইহা মনের অজ্ঞাতে অস্পষ্ট যাহাদিগকে আপনার মত না দেখেন, যাহাদিগকে পবিত্র সুন্দর না দেখেন বা অজ্ঞানাচ্ছন্ন না ভাবেন তাহাদিগকে উহা ভালবাসেন না। সেখানে উহা অপ্রকাশিত-জ্ঞানোত্থিত প্রেম নয়ত কি? জ্ঞানো-ত্থিত প্রেমে আর এই প্রেমে প্রভেদ এই যে "জ্ঞানোত্থিত প্রেম" পরিষ্কার করিয়া অন্যান্য জীবদেহের প্রাণকে ও ভৌতিক পদার্থ-সমূহকে আপনার জিনিষ দেখিয়া উদিত হয়। এ প্রেম আপ-নার সদৃশ দেখিয়া উদিত হয় বটে, কিন্তু মনে "এক জ্ঞানের" আলোকে স্পষ্ট আলোকিত হয না এইমাত্র প্রভেদ। আমি দেখিযাছি, পণ্ডিতের অনেক সত্য মূর্খেরা হৃদয়ঙ্গম করে, কিন্তু তাহার ব্যখ্যা জানে না। এ কারণে মূর্খদের মন

জ্ঞানালোকে আলোকিত হয় না। ঐ যে মেঘ ডাকিতেছে, উহা পণ্ডিত ও মূর্খের কর্ণে একপ্রকার ধ্বনিত হইতেছে। শব্দ যে কি প্রকারে জন্মে, তাহা পণ্ডিত উত্তমরূপে জানেন, সুতরাং পণ্ডিতের মন জ্ঞানালোকে আলোকিত। মূর্খ শব্দের কারণ জানে বটে, কিন্তু পরিষ্কৃতরূপে জানে না। মূর্খ তাহা হৃদয়ের সহিত জানিলেও তাহার প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। মূর্খ জানে কি না তাহা এই ঘটনায় দেখ। তুমি যদি এক মূর্খকে শব্দের উৎপত্তির বিষয় জিজ্ঞাসা কর সে তাহা বলিতে পারিবে না অথচ শব্দের কারণ ঘর্ষণ নয় একথা বলিলেও সে বিশ্বাস করিবে না। এই অপ্রকাশিত-জ্ঞানোত্থিত প্রেম তাহাই। উহা সকলকে আপনার জানিয়া উদিত হয় বটে, কিন্তু তাহা পরিষ্কার পূর্ব্বক জানে না।

ভাই! পাঁচপ্রকার প্রেমের বিষয় বলা হইল। সকল-প্রকার প্রেমের নিকট আমরা এই জানিতে পারি, যাহাদিগকে আমরা ভালবাসি তাহারা আমাদের আত্মার অংশ, কারণ পূর্ব্বেই বারংবার বলিয়াছি যে প্রেম অন্যকে আপনার বলিয়া না জানিলে উদ্রিক্ত হইয়া ভালবাসেন না, অর্থাৎ আপনার জ্ঞান না করিয়া মিলিত হন না। আমরা আরও একপ্রকার জানিতে পারি যে প্রেমই আমাদের প্রাণ। দেখ, সকলপ্রকার অজ্ঞান বা অজ্ঞানোদ্ভূতবৃত্তি আমাদের মস্তিষ্ক হইতে দূরীভূত হইলে অব শিষ্ট প্রেমমাত্র থাকে। যদি অজ্ঞান বা অজ্ঞানোদ্ভূতবৃত্তি-সমূহ প্রাণ হইত, তাহা হইলে অজ্ঞান ও অজ্ঞানোদ্ভূতবৃত্তি দূরীভূত হইলে শরীরে জীবন বলিয়া কোন বস্তু থাকিত না, এবং অব-শিষ্ট প্রেম-প্রাণ যদি প্রাণ না হইত, তাহা হইলে প্রেম কখন

জীবন বলিয়া পরিচয় দিতে পারিত না, এবং প্রেমকে তাড়াই-বার চেষ্টা করিলে তাড়ান যাইত, কিন্তু উহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলে তাড়ান যায় না, কেবল অজ্ঞান ও পাপে ঢাকা থাকে মাত্র। এই কারণেও প্রেমকে প্রাণ বলিয়া পরিচয় দিতে কে না সাহস করে? প্রাণ যদি পবিত্র হয়, আপনার প্রকৃতমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়, তাহা হইলে প্রেমই ত প্রাণ। কোন্ সজীব বস্তু আপনার অমঙ্গল আপনি ইচ্ছা করে? বা কোন্ বস্তুর ধর্ম্ম (গুণ) আপনার অমঙ্গল পদার্থ? অজ্ঞান বা অজ্ঞানোদ্ভূত-বৃত্তি-সমূহ যদি দেহের ও মস্তিষ্কের অনিষ্টকারী পদার্থ হয়, তাহা হইলে তাহা প্রাণ নহে এবং তাহা যে প্রাণের শত্রু, এ কথা সকলে সাহস করিয়াও বলিতে পারে। আপনার অনিষ্ট কে কবে সাধন করে? যদি না করে, অজ্ঞান বা অজ্ঞানোদ্ভূত-বৃত্তি-সমূহ প্রাণ নহে, সুতরাং শরীরের ও মস্তিষ্কের ইষ্টকারী পদার্থই প্রাণ এবং সেই ইষ্টকারী পদার্থই প্রেম। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণে প্রেম যদি প্রাণ হইল, তবে এস ভাই সকল। আমরা সকলকে ভাই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করি, এস আমরা সকলে ভ্রাতাদের রূপ-সংযুক্ত গুণ ও আন্তরিক রূপ প্রভৃতি (গুণ) দেখিয়া ভালবাসি, আর যে সমস্ত ভ্রাতার আন্তরিক রূপাদি (গুণ) অজ্ঞানাচ্ছন্ন রহিয়াছে, প্রাণপণে তাহা দূর করিতে চেষ্টা করি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি "জ্ঞানোত্থিত প্রেম বা অপ্রকাশিত-জ্ঞানোত্থিত প্রেম অর্থাৎ ভ্রাতৃগণকে প্রকাশ্যে বা মনের অপ্রকাশ্যে আপন বলিয়া জানা মিথ্যা নয়। যখন বাদরায়ণ, চৈতন্য, খৃষ্ট, সক্রেতিশ প্রভৃতি মহাত্মারা ঐ দুইটী প্রেমে চালিত হইয়া সকলকে ভাই ভাই বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং ভাইদিগকে অজ্ঞানাচ্ছন্নতা

হইতে মুক্ত করিতে অশেষ চেষ্টার ফলে কৃতকার্য্য হইয়া, ইঁহারা সকলে যে ভাই ভাই ইহা জগতের নিকট প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, তখন আর ভ্রাতৃভাবের সন্দেহ করিয়া আত্মাকে জীবন্মৃত করিবার প্রয়োজন কি? সকলকে ভাই ভাই না ভাবিলে ও ভাবিয়া তাঁহাদের মঙ্গলের চেষ্টা না করিলে আত্মা সম্পূর্ণরূপে বিকাশ হইয়া প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারে না। বাহ্যিক জাগতিক সত্যের সহিত যখন আন্তরিক সত্য মিলিতেছে, তখন আর কে কুতার্কিককে ভয় করিয়া থাকিবে? এক মানসিক সত্যের (প্রেমের) কেহ সমকক্ষ নয়, তাঁহার সহিত যখন জাগতিক সত্য মিলিয়াছেন, তখন আর অন্যকে ভয় কি?

রাম মিথ্যা কথা কহিতেছে। স্পষ্ট দেখ, রামের সত্যপ্রিয় আত্মায় সত্য লুকাইয়া রহিয়াছে এবং মিথ্যা অজ্ঞানে সত্যকে ঢাকিয়া রাখিতেছে। এইপ্রকার সমস্ত অজ্ঞান ও পাপ মস্তিষ্কস্থিত আত্মার বিরুদ্ধে যে কার্য্য করিতেছে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। রামের ঐ পাপ ও অজ্ঞান যাইতে পারে, কিন্তু সত্যাদি-গুণাবলম্বী আত্মা যাইতে পারে না, কেবল পাপে ঢাকা থাকিতে পারে মাত্র, অথবা নিষ্পাপ হইয়া বিকাশ হইবে মাত্র। তবে আর পাপ অজ্ঞানকে আত্মা বল কেন? ভাই ভাই বলা আত্মার ধর্ম্ম এবং সমস্ত-গুণ-বিকাশের প্রধান কারণ; তবে আর নিশ্চেষ্ট কেন? ভাই ভাই ভাবে সকলে ভাই হইয়া যাইবে, মন পাপ ও অজ্ঞান শূন্য হইবে। মন নিষ্পাপ ও অজ্ঞান শূন্য হইলে আত্মার দুঃখ রহিবে কেমন করে? অজ্ঞান ও পাপ ভিন্ন আত্মার দুঃখ কি? দর্পণে যদি ময়লা না রহিল, তবে আর দর্পণের অনিষ্টকারক পদার্থ কি? সেইপ্রকার দর্পণ স্বরূপ

আত্মায় যদি ময়লা না রহিল, তবে আর আত্মার দুঃখ কি? তুমি এক বিন্দু জল, তুমি যদি আপনার সহিত অসংখ্য জীবনবিন্দু মিলাও, তবে কি তুমি মহৎ হইবে না? অবশ্য হইবে। তাই বলি, যদি মহৎ হইতেও ইচ্ছা থাকে, তবে ভ্রাতৃপ্রেম কর। মহত্বের সহিত শক্তির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, সুতরাং তুমি মহৎ হইলে অসীমশক্তিশালীও হইবে। শক্তি সুখ, যাঁহার শক্তি আছে, তিনিই দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইবার অধিকারী। শক্তিশালী পুরুষকে কোন দুঃখই আক্রমণ করিতে পারে না। তাই বলি, যদি মহত্ত্ব ও তৎসঙ্গে শক্তি-দেবী লাভ করিয়া সুখী হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ভাতৃপ্রেম ছাড়িও না। শক্তি-দেবীর মত আর কি কোন দেব-দেবী আছে? বা শক্তির প্রকৃত পূজা না করিলে ও শক্তির কৃপা না থাকিলে কি কোন দেব দেবী ও মানবাদি জীব আদর পায়? অথবা বাঁচিয়া থাকিতে পারে?

এই ভারতে ভাই ভাই ভাব না থাকাতে প্রায় ২৪ কোটী মানব থাকিতেও ভারতে একটী মানবজাতীয় জীবনখণ্ড নাই। হায়! কবে আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মত সকলকে আত্মবৎ দেখিয়া তাঁহাদের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম হইব? যখন আমাদের তাঁহাদের মত বিশ্বপ্রেম নাই, তখন আমাদের সুখ গৌরব প্রভৃতির কোন পদার্থ কি থাকিতে পারে?

এক্ষণে আমাদের মধ্যে অনেকে যে ধর্ম্ম বিশ্বাস করে, তাহাতে প্রেম নাই, যে ধর্ম্মে প্রেম নাই, সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়, তাহা অধর্ম্মের অপর নাম মাত্র।

দেখিতে পাওয়া যায়, যখন কোন জাতির অধঃপতন আরম্ভ হয়, তখন সেই জাতির উন্নতিসময়ের উন্নতভাববোধক শব্দগুলিতে মন্দভাব প্রবেশ করিয়া তাহা মন্দভাববোধক হইয়া পড়ে। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, প্রেম বা প্রীতি বলিলে আর্য্যেরা যেরূপ বুঝিতেছেন, আমরা এখন আর সেরূপ বুঝি না, সুতরাং আমরা প্রেম বিনা নিশ্চয় অধঃপাতে গিয়াছি। প্রেম বলিলে এখন আমাদের নরনারীর জঘন্য মিলন ও ভাব মনে পড়ে। স্বার্থপূর্ণ প্রণয়কে আমরা এখন প্রণয় মনে করি। তরঙ্গিণী সুন্দরী, তরঙ্গিণী আমাকে ভাল বাসিলে আমি সুখী হইব, এই আশায় আমি তরঙ্গিণীকে ভালবাসি। তরঙ্গিণী যদি আমাকে না ভালবাসে, আমি তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াই। অধিক কি, তাহাকে ধ্বংস করিতে ও আমি সঙ্কুচিত হই না। কামক্রিয়াকে প্রণয়ের উৎপত্তির মূল ভাবিয়া আমরা কামক্রিয়ায় মগ্ন হই, এবং কামের আদর্শ নায়ক নায়িকা সৃজন করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিই। পবিত্র-আর্য্যহৃদয়নিঃসৃত সর্ব্বোন্নতিবোধক প্রেমশব্দে এরূপ জঘন্য ভাব প্রবেশ করিতে দেখিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি না কাঁদিয়া থাকিতে পারেন? আমরা যদি তাঁহাদের প্রকৃত সন্তান হইতাম, তাহা হইলে দেবদেহে সয়তানের আবির্ভাব এবং সয়তান কর্ত্তৃক দেবদেহের দুর্গতি দেখিতাম না। সর্ব্বধ্বংসী কামকে দেবদেহে চালনা করিতে ও পাপ বিষ্ঠা-মূত্রাদি মাখাইতে দেখিলে যে না কাঁদে তাহাকে মনুষ্য বলিতে লজ্জা বোধ করে। তাই! আমি [illegible] নিকট এই মাত্র আশা করি, তাহারা যেন কখনই এই পিশাচকে প্রেম না বলে।

আরও ভাই! ঐ নরনারীর দাম্পত্য-প্রেম-ভাব কামবির-হিত হইলেও মন্দ। আমি দেখিয়াছি, যাঁহারা দেশের উন্নতি করিতে সক্ষম, এরূপ অনেক শিক্ষিত যুবক ঐ দাম্পত্যপ্রেমভাবে অন্ধ হইয়া থাকিবার কারণ তাঁহাদের জীবন সঙ্কীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বলিতে কি, তাঁহারা যেন বিশ্বপ্রেমিকের কাছে ও নিরপেক্ষ জ্ঞানের কাছে জগতে থাকিয়াও যেন একটা নরকে পড়িয়া রহিয়াছেন, জগতে থাকিয়াও জগৎকে দেখিতে পাইতেছেন না ও জগতে বিচরণ করিতে পারিতেছেন না, ইহা কি দুঃখের বিষয়। প্রেমের মূলধর্ম্ম উপকার। যে প্রেমে উপকার-ধর্ম্ম নাই, তাহাকে প্রেম বলিও না। সখ্য-দাম্পত্যাদি সকল প্রেমের মূল-ধর্ম্ম উপকার অর্থাৎ পরকে সুখ দিয়া সুখী হওয়া ধর্ম্ম করিয়া দিয়া প্রণয নামে আখ্যাত কর, যদি না পার, তাহার চিরপ্রচলিত নীচার্থবোধক শব্দে নাম দিও, কদাচিৎ আর্য্যদের সর্ব্বোন্নতি-বোধক প্রেম-নাম দিও না ইতি। ১২৯২ সাল। তারিখ ২ বৈশাখ।

পুঃ আমার এই পত্র পড়িয়া তুমি হয়ত মনে করিতে পার, আমি একেবারে দাম্পত্য-প্রেমের বিরোধী। তোমার মত চিন্তা-শীল জ্ঞানী ব্যক্তি যদি ইহা মনে করে, তাহা হইলে আমি অতি দুঃখিত হইব, কারণ যাঁহারা সংসার হইতে সুখ তুলিতে চান, তাঁহাদিগকে আমি মহাপাপী বলিয়া জ্ঞান করি। আমি জানি, মানব সতত এক সুখে থাকিতে পারে না; কারণ কালক্রমে মর্ম-সুখে আর সুখ থাকে না। এই কারণে সংসারে যাবতীয় সুখ রাখা আবশ্যক। কেবল বিশ্বপ্রেম-জনিত সুখ সদা নূতন; কারণ বিশ্বপ্রেমিককে বিশ্বজনকে সুখ দিবার জন্য নানা সুখ আস্বাদন

ও আবিষ্কার কেবিতে হয়। জগৎকে বিবিধ সুখ দেওয়া যখন বিশ্বপ্রেমিকের ধর্ম্ম, যখন জগতে যাবতীয় সুখ বিশ্বপ্রেম-সুখের অন্তর্গত, তখন সমস্ত সুখ রাখা বিশ্বপ্রেমিকের অত্যন্ত আবশ্যক। যিনি তাহা আবশ্যক মনে না করিয়া দাম্পত্যাদি সুখ জগৎ হইতে তুলিতে চান, তিনি বিশ্বপ্রেমিক নন, বরং মহাপাপী। আমি সকলকে বিশ্বপ্রেমিক হইয়া সকল সুখ আস্বাদন করিবার জন্য এই পত্র লিখিয়া তোমাকে জানাইতেছি। বিশ্বপ্রেম আমাদের জীবন, বিশ্ব সুখ-চেষ্টার কার্য্যই আমাদের জীবনের কার্য্য, বিশ্বপ্রেম সুখ অনন্ত, সকল-সুখ-রক্ষক ও নূতন-নূতন-আবিষ্কারক। বিশ্বপ্রেমকে তুচ্ছ করিয়া কেবল দাম্পত্যাদি সুখে মগ্ন হওয়াবই আমি বিরোধী, কারণ ঐ সুখে শুষ্ক মগ্ন হইয়া মানব মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া প্রত্যক্ষ নরকে ডুবিয়া থাকে। আমি দেবাদিদেব মহাদেবের ন্যায়, হোমিওপ্যাথিক-স্রষ্টা হানিমান ও জনষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতির ন্যায় বিশ্বপ্রেমিক হইতে অনুরোধ করি। চৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বিশ্বপ্রেমিককে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বপ্রেমিক বলিতে পারি না এবং ঐপ্রকার বিশ্বপ্রেমিক হইতেও অনুরোধ করি না। যাঁহারা দাম্পত্যাদি সুখ ছাড়িয়া জীবনকে অনেক পরিমাণে নীরস করিয়াছেন, কতক পরিমাণে বিশ্বভ্রান্তপ্রেম-সুখ তাঁহাদের জীবনে থাকিলেও তাঁহারা সাধারণের সম্পূর্ণ আদর্শ নন।

যে মতে জগতে প্রকৃত অনিষ্ট হয়, ভ্রমক্রমেও তাহাকে জগতের ইষ্ট জ্ঞান করিয়া যে বিশ্বপ্রেমিক ঐ ভ্রান্ত বিশ্বপ্রেমের কার্য্য করেন, তাঁহার হৃদয়ে বিশ্বপ্রেম-জনিত প্রকৃত সুখ হয় কি না এ বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। সাবধান, তুমি

যদি প্রকৃত-বিশ্বপ্রেমিক হইতে চাও, প্রকৃত-বিশ্বপ্রেম-জনিত সুখ লাভ করিতে ইচ্ছা কর, বিশ্বের প্রকৃত সুখ অগ্রে পরীক্ষা করিয়া বিশ্বপ্রেম-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও, দেখিও যেন তোমার কার্য্যে জগতের অনিষ্ট না হয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেবাদিদেব মহাদেবের ন্যায় আমি বিশ্বপ্রেমিক হইতে অনুরোধ করি। দেবাদিদেব মহাদেবের পার্ব্বতীনাম্নী গৃহিণী ছিলেন। দেবী পার্ব্বতী মহাদেবকে এবং মহাদেব পার্ব্বতীকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তাহার জলন্ত প্রমাণ "দক্ষযজ্ঞ"। তথাচ কে বলিতে পারে, অশিক্ষিত স্ত্রীপ্রাণ যুবকের ন্যায় শিব স্ত্রী-উপাসক স্ত্রৈণ? কে বলিতে পারে মহাদেব বিশ্বপ্রেমিক নন? চিন্তাশীলদের চক্ষে মহাদেব মানবকুলের অকাল-মৃত্যু-নিবারণের জন্য সতত শ্মশানে শ্মশানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, শরীরে কি কি আছে দেখিবার জন্য মৃতদেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতেছেন, কখন বা পর্ব্বতে পর্ব্বতে বনে বনে বেড়াইয়া কোন্ বস্তুর কি গুণ, কোন্ উদ্ভিদ বা ধাতু দ্বারা মানবের কি উপকার হইতে পারে, কি রোগ নিবারণ হইতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন, কখন বা অকালমৃত্যুর ও আত্মোন্নতির উপায় আবিষ্কারের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিতেছেন এবং বহু চিন্তার পর যোগাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করিতেছেন, জীবকে সুখ দিবার জন্য কখন বা সঙ্গীতশাস্ত্র প্রণয়ন করিতেছেন, কখন বা কার্য্য দ্বারা মানবকে আপনার সহধর্ম্মিণীর ন্যায় নারীর সহ দাম্পত্য-সুখ লাভ করিতে উপদেশ দিতেছেন। ঐপ্রকার বহু বিশ্বপ্রেম-কার্য্যে শিবের দাম্পত্য-প্রেম ডুবিয়া গিয়াছে। স্ত্রী আছে কিন্তু তিনি স্ত্রৈণ নন, প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিক, পরোপকারের

জন্য বিষ পর্য্যন্ত খাইতে ভীত নন, পরোপকারের জন্য বিষ খাইলেন, কিন্তু সহধর্ম্মিণী নিবারণ করিলেন না, বরং সন্তুষ্ট হইলেন। শিবের ঐ সমস্ত গুণ দেখিয়া তিনি (পার্ব্বতী) মহাদেবকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তবে তিনি বিমর্ষা হইবেন কেন? দেবাদিদেব মহাদেবের গুণ দেখিয়া আমি সকলকে ঐপ্রকার বিশ্বপ্রেমিক হইতে অনুরোধ করি, এবং সর্ব্বপূজ্যা ভগবতী-দেবীর গুণ দেখিয়া আমি ঐপ্রকার বিশ্বপ্রেমিকা স্ত্রীর সহিত বিশ্বপ্রেমিককে ও বিশ্বপ্রেমিকাকে ঐপ্রকার বিশ্বপ্রেমিক পুরুষের সহিত দাম্পত্যপ্রেম-সুখ লাভ করিতে অনুরোধ করি। শিব ও ভগবতী দাম্পত্য-সুখ লাভ করিতেন বটে, কিন্তু ঐবৃত্তিজনিত কার্য্যকে তাঁহারা জীবনের কার্য্য বলিয়া ভাবিতেন না। এই কারণে তাঁহারা ঐ সুখ লাভ করিয়া প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিক বা বিশ্বপ্রেমিকা।

সকলের সকল বৃত্তিই কম বা বেশী পরিমাণে আছে, কিন্তু যাঁহার যে বৃত্তি প্রবল, তাঁহাকে লোকে সেই বৃত্তির লোক বলিয়া থাকে। এই কারণে মহাদেব বিশ্বপ্রেমিক ও তৎসহযোগিনী ভগবতী বিশ্বপ্রেমিকা। কারণ তাঁহাদের বিশ্বপ্রেমবৃত্তি প্রবল ছিল। দাম্পত্যাদি অন্যান্য বৃত্তি তাঁহাদের ছিল বটে, কিন্তু তাহা এত ক্ষীণ যে অতি কষ্টেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

যে কারণে দেবাদিদেব মহাদেব ও দেবী ভগবতী দাম্পত্যাদি প্রেমাস্বাদন করিয়াও বিশ্বপ্রেমিক ও বিশ্বপ্রেমিকা হইয়াছেন, সেই কারণে জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিল টেলর পত্নীর সহ ও টেলর-পত্নী মিলের সহ, এবং অন্যান্য ব্যক্তি দাম্পত্য সুখাস্বাদন করিয়াও বিশ্বপ্রেমিক ও বিশ্বপ্রেমিকা হইয়াছেন। আমি এইপ্রকার সকল

লোককে বিশ্বপ্রেমিক হইয়া বিশ্বপ্রেমিকা স্ত্রীর সহিত ও বিশ্ব-প্রেমিকা বিশ্বপ্রেমিকের সহ দাম্পত্যপ্রেম-সুখ লাভ করিতে অনুবোধ কবি ইতি।

তোমার

শ্রীপ্রমদাচরণ সেন

স্বাধীনচিন্তাবিষয়ক দ্বিতীয় পত্র।

ভাই প্রমদাচরণ। তোমার প্রেমবিষয়ক পত্র সাদরে গ্রহণ ও নিবিষ্টমনে পাঠ করিয়া জানিয়াছি, তুমি আমাকে যে বিষয়ে পত্র লিখিয়াছ, সে বিষয়ে তুমি স্বয়ং ভুক্তভোগী।

আজি তোমাকে আমি দেশের আর একটী অবস্থা জানাইব। তুমি এই অবস্থা জানিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইবে ভাবিয়া নিম্নলিখিত ঘটনা জানাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি জানি, তুমি পাশ্চাত্যশিক্ষার পক্ষপাতী। পাশ্চাত্যশিক্ষা আত্মাকে স্বাধীনতা প্রদান করে এবং ভাল মন্দ দেখিবার ও গ্রহণ করিবার শক্তি দান করে। এমন কি, ইয়োরোপ ইহার জননী হইলেও ইহা মায়েরও প্রকৃত দোষসমূহ দেখিতে পায় এবং ঐ সমস্ত দোষকে ঘৃণা করে ও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না। ইত্যাদি যাবতীয় গুণ উহাতে দেখিয়া তুমি পাশ্চাত্যশিক্ষা ভালবাস। যাহা জীবনের হিতকারী তাহাই জীবনের বন্ধু বা জীবন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অতএব পাশ্চাত্যশিক্ষা অন্য দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া তুমি অন্য ভাব না এবং তাহাকে ভারতের বন্ধু বা জীবন বলিয়া বিবেচনা কর। তুমি এক দিন বলিয়াছিলে, "ইহার দ্বিতীয় জন্ম ইয়োরোপে হইয়াছে বটে, কিন্তু আদি জন্ম ভারতের বিজ্ঞান ও দর্শনযুগে।" তুমি আরও বলিয়াছিলে, "ঐ শিক্ষা সমস্ত মানবজীবনে সতত অপ্রকাশ রহিয়াছে। যিনি

প্রচলিত শিক্ষাভাবে কোন কারণে স্বাধীন হইয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবেন, তিনি ইয়োরোপীয় ভাষা না জানিলেও পাশ্চাত্য-শিক্ষার মতগুলি তাঁহার জীবনে উদিত হইবে। ইহার প্রমাণ মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী। পাশ্চাত্যশিক্ষার বীজ সকলের জীবনের সহিত জগতে আসে বটে, কিন্তু আত্মবিকাশ-বিরুদ্ধশিক্ষায় তাহা রুদ্ধ হইয়া পড়ে। এই কারণে ভারতে ইয়োরোপীয়শিক্ষা ব্যতিরেকে ভারতের মানবজীবন অধিকাংশ স্বয়ং পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফল লাভ করিতে পারিতেছে না। এই সমস্ত কারণ দেখিয়া আমি বিবেচনা করি, তুমি পাশ্চাত্যশিক্ষা-বিস্তারের কথা শুনিয়া অতি আহ্লাদিত হইবে। এক্ষণে তোমার আহ্লাদের কারণ বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আজি কয়েকদিন হইয়া গেল, আমি আমার কোন পল্লীগ্রামের বন্ধুর বাটীতে যাইবার অভিপ্রায়ে সহর ছাড়িয়া পূর্ব্বাঞ্চলে গিয়াছিলাম। একদিন অপরাহ্নে আমি একটী বৃহৎ ময়দানমধ্যস্থ রাস্তা দিয়া হাঁটিতেছি, এমন সময়ে আকাশের পশ্চিম দিক হইতে নবনীল জলধর মহাডম্বর করিয়া আসিতে লাগিল. দেখিতে দেখিতে ঝড় বহিতে লাগিল ও তৎসঙ্গে মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিল। হু হু করিয়া বৃষ্টি আসিতে দেখিয়া আমি ময়দানের দক্ষিণদিকস্থিত পল্লীর পানে দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলাম এবং একটী নারিকেল-বৃক্ষ-বেষ্টিত গৃহে যাইয়া আশ্রয় লইলাম। বাটীটী দক্ষিণদ্বারী। বাটীর সম্মুখে একটী সুন্দর চণ্ডীমণ্ডপ রহিয়াছে। আমি তাহাতে আশ্রয় লইলাম এবং দেখিলাম, বাটীতে একটী পঞ্চবিংশতিবর্ষবয়স্কা সুন্দরী, একটী অর্দ্ধবয়স্কা দাসী, আর একটী ভোজপুরী দ্বারপাল রহিয়াছে।

গৃহস্বামিনী আমাকে সিক্তবসন দেখিয়া পরিধান করিতে শুষ্ক একখানি কাপড় দিলেন এবং আমাকে তামাক দিবার নিমিত্ত দাসীকে হুকুম করিলেন। আমি তাম্রকূট-দেবীর আরাধনায় নিযুক্ত, এই সময়ে কতকগুলি সন্ন্যাসী মোহান্তসহ আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় লইল। তাহাদের মাথায় তালপত্রের ছাতা ছিল; বোধ হয়, এই কারণে তাহাদের বস্ত্র আর্দ্র হয় নাই। তাহারা স্ব স্ব কম্বল, ব্যাঘ্র ও হরিণের চর্ম্ম বিছাইল এবং তদুপরি বসিয়া গঞ্জিকা সেবন করিতে করিতে গৃহস্বামিনীকে ময়দা ঘৃত প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য বারংবার যাচ্ঞা করিতে লাগিল। গৃহস্বামিনী বিনম্রভাবে বলিলেন, "অদ্য যিনি এ দরিদ্রার ঘরে আশ্রয় লইবেন, তাঁহাকেই আমার সাধ্যমত সেবা করা উচিত; কারণ যাঁহারা আজি বিপদে পড়িয়া গৃহে আশ্রয় লইবেন, তাঁহারা লোভের বশীভূত হইয়া লইবেন না। কিন্তু আপনারা বা আপনাদের ন্যায় কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক আশ্রয় লইলে, আমি আপনাদিগকে বা আপনাদের মত লোকদিগকে দান বা আহার দিতে স্বীকার করিতাম না।"

গৃহস্বামিনীর এই কথায় বোধ হইল, তিনি যেন মানবহিতৈষিণী সুতর্কপ্রিয়া, যেন জ্ঞানালোচনা করিবার ও সন্ন্যাসীদিগকে জ্ঞান দিবার জন্যই সন্ন্যাসীদের সহিত তর্ক করিতে অগ্রসর হইলেন।

মোহান্ত। কেন?

গৃহস্বামিনী। প্রভো! শুনুন, মানবের মনে কতকগুলি শুভশক্তি আছে। সেই শুভশক্তিগুলি দ্বারা তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ হইয়া মন ও তৎসঙ্গে শরীর পোষণ করিতে পারে।

সেই সমস্ত সুশক্তির বিকাশের হেতু স্বাধীনতা। সেই সমস্ত সুশক্তির অধিকাংশ বা অল্প যতদিন মানবের মনে বিকাশ পায়, ততদিন মানবের জীবনের অস্তিত্বের পরিচয় দেয়। অজ্ঞান বা অজ্ঞানোদ্ভূত-কুবৃত্তিগুলির কুশক্তি সেই সমস্ত সুশক্তি অপেক্ষা প্রবল হইলে সেই সমস্ত সুশক্তি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। দেব। কুশক্তি বিকাশ হওয়ার প্রধান কারণ পরমুখাপেক্ষী হওয়া। আপনারা পাপের ভয়ে বৈরাগ্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন বটে, কিন্তু উদরের জ্বালায় পরমুখাপেক্ষী হওয়াতে লোভ প্রভৃতি কুশক্তি সকল প্রবল হইয়া আপনাদের সুশক্তিগুলিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। যে কারণে—

মোহান্ত আর গৃহস্বামিনীকে কথা বলিতে না দিয়া যেন তদীয় জ্ঞানের পরিচয়ের জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি। কুশক্তি-গুলি কি আত্মার পদার্থ নয়?

গৃহস্বামিনী। জগতের যাবতীয় পদার্থ আলোচনা করিয়া দেখুন, কোন পদার্থেই আপনার অনিষ্টকর বস্তু দেখিতে পাই-বেন না; দেখিতে পাইবেন, সকল পদার্থই আপন আপন জীবন-নির্ব্বাহের পদার্থ কম বা বেশী লইয়া জন্মগ্রহণ করি-য়াছে। যতক্ষণ জীবন-নির্ব্বাহের পদার্থ না পায়, ততক্ষণ কেহ জন্মগ্রহণ করে না। দেখুন, গাছ মরিয়া যাইতেছে। গাছের অনিষ্টকর পোকা বা অন্য কোন অনিষ্টকর পদার্থ গাছের অনিষ্ট করিতেছে। গাছের ধর্ম্ম (জীবনাংশ) গাছের অনিষ্ট সাধন করিতেছে না, অর্থাৎ গাছ গাছের আপনার আপনি অনিষ্ট সাধন করিতেছে না; তরুজীবনের শত্রুই তরুর অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। প্রভো! আমি এই সংসারে দুইটি মূল পদার্থ

দেখিতে পাই, একটি জীবন, আর একটি মৃত্যু। জীবন-মৃত্যুর বিরুদ্ধগুণাবলম্বী বিরুদ্ধ পদার্থ, এবং মৃত্যু, জীবনের বিরুদ্ধ-গুণাবলম্বী বিরুদ্ধ পদার্থ। সংসারে এই দুই পদার্থ অহোরাত্র যুদ্ধ করিতেছে। মৃত্যুর কুশক্তিরূপ অংশ সকল জীবনকে নাশ করিবার জন্য ঘুরিতেছে যুঝিতেছে ও সময়ে সময়ে কার্য্যসিদ্ধও করিতেছে। জীবনের সুশক্তিরূপ অংশ সকল মৃত্যুর মৃত্যু ও আত্মরক্ষা করিবার জন্য ঘুরিতেছে, যুঝিতেছে ও সময়ে সময়ে কার্য্যসিদ্ধও করিতেছে। তবে কি করিয়া মৃত্যুর কুশক্তি সকল জীবনের পদার্থ হইবে? আরও শুনুন, উহারা পরস্পর পরস্পরের মৃত্যু এবং স্বয়ং স্বয়ং জীবন, অর্থাৎ একের কাছে বিপরীতটি মৃত্যু, আপনি জীবন, এবং ঐ মৃত্যু পুনরায় আপনি জীবন ও পরটি মৃত্যু। জগতের সমস্ত বস্তুর জীবন ও মৃত্যু আছে। যে বিষ মানব-জীবনের মৃত্যু, সেই বিষ-জীবনের আবার মৃত্যু-পদার্থ আছে। জীবনের নিয়ম এই, গুণ বা শক্তিসমূহ বিকাশ করিয়া আত্মরক্ষা ও আপনাকে সুখী করা। মৃত্যুর নিয়ম এই, জীবনকে গ্রাস করা। যে পদার্থের জীবনের যাহা গুণ বা শক্তি তাহা উর্দ্ধ-গামী। ঐ গুণকে যে ঢাকা দেয় বা নাশ করে, তাহা জীবনের বিরুদ্ধ মৃত্যু-পদার্থ। যদি কুশক্তি-আত্মপদার্থ হইত, তাহা হইলে তাহা জীবনকে উর্দ্ধগামী করিত, নাশ করিত না, অথবা জীবনকে অন্ধকার করিত না। সুতরাং মানব জীবনের কুশক্তিসমূহ মানব-জীবনের মৃত্যু। মানব-জীবনের মৃত্যু কি মানব-জীবনের আত্মপদার্থ হইতে পারে? এবং মৃত্যু ও জীবন কি একযোগ হইতে পারে?

মোহান্ত। দেবি! আপনার কথাতে এই বুঝিলাম, জীবন একটি পদার্থ, আর তদ্বিরুদ্ধ-গুণাবলম্বী মৃত্যু একটি পদার্থ।

উহারা পরস্পর পরস্পরের শত্রু ও মৃত্যু। মৃত্যুর লক্ষণ এই যে, জীবনধর্ম্মকে গ্রাস ও জীবনকে ধ্বংস করা, সুতরাং জীবনকে ধ্বংস করিবার জন্ত নিজ শক্তিগুলি দ্বারা অধোগামী করা; অধোগামী না করিলে মারিতে পারা যায় না। জীবনের লক্ষণ এই যে, স্বগুণাবলীকে উর্দ্ধগামিনী করিয়া আপনাকে রক্ষা ও আপনাকে বিবিধসুখে আলোকিত করা। কুগুণ যখন আমাদের মনকে অন্ধকার, অধোগামী, শরীর ও প্রাণ ধ্বংস করে বা গুণ সকল ঢাকা দেয়, তখন কুশক্তি-সমূহ আমাদের মৃত্যু। পরের নিকট আশা করিবা-মাত্র আপনার সুশক্তি-সমূহ অদৃশ্য হইয়া যায়, সুতরাং আমরা বাচিয়া থাকিতেও মরিয়া গিয়াছি। আমরা মরিয়া গিয়াছি সত্য, কিন্তু আপনি আমাদিগের মত অতিথিদিগকে আহার দিবার নিমিত্ত আপনার মনে দয়া প্রভৃতি সুবৃত্তি সকল বিকাশ হইয়া আপনারত জীবন থাকে? সুতরাং আপনার সুখত থাকিবে? আপনি যখন মনোনীচকারিপদার্থকে মৃত্যু-দূত বলিয়াছেন, তখন তাহাকে অবশ্য জীবনের দুঃখ এবং গুণ বা সুশক্তিগুলিকে জীবনের সুখ মুখে না বলিলেও ঐ কথায় প্রকাশ করিয়াছেন। জীবনের গুণ যাহা তাহা প্রায় পরের ইষ্ট করাই। পরের ইষ্ট করাই যখন আপনারা জীবন, সুতরাং সুখ এবং গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তখন অতিথিদিগকে তাড়াইয়া দিবেন কেন?

গৃহস্বামিনী। আপনি সত্যই বুঝিয়াছেন, জীবনের যাহা গুণ, সুতরাং জ্ঞানের মতে যাহা সুখ বা জীবনাংশ, সুতরাং জীবন তাহা অন্ত জীবনকে সুখ দিবার চেষ্টা বা সুখ দেওয়া। অন্তর-জগতের নিয়ম এই যে, 'পরকে সুখ দিবার চেষ্টা করিলে

জীবনের সমস্ত গুণ, সুতরাং (জ্ঞানের আদেশমতে) সমস্ত সুখ, বা সমস্ত জীবন বিকাশ হইয়া জীবন প্রকৃত সুখী হয়, এবং আপনাকে প্রকৃত সুখ দিবার চেষ্টা করিলে অন্যান্য জীবনকে সুখ দিবার চেষ্টা ও চেষ্টার ফল সুখ দিতে হয়।"

জ্ঞানের আদেশে অন্যান্য জীবনের সুখচেষ্টা বা সুখ দেওয়াকে আমি জীবন, গুণ বা সুখ স্বীকার করিলাম, কিন্তু আপনাদিগকে আহার দিলে বা দান করিলে আপনাদের আত্মার যে অবনতি হইবে? আমি যখন আপনাদের উপকার দেখিতে পাইতেছি না, তখন আমার জীবনের সুন্দর বৃত্তিসমূহ বিকাশ হইবে কি প্রকারে? সুতরাং সুখও বা হইবে কি প্রকারে? অন্যান্য জীবনকে সুখ দিবা বা সুখ দেওয়ার চেষ্টায় অথবা তাহাদের সুখ দেখিয়া যখন আমাদের জীবন সুখ লাভ করে, তখন আপনাদের জীবনের অধোগতি, সুতরাং দুঃখ দেখিয়া আমার দুঃখ বৈ সুখ হইবে কি প্রকারে? অন্যান্য জীবনকে সুখ দিবার চেষ্টা বা সুখ দেওয়া যখন আত্মার সুখ হয়, তখন অন্যান্য জীবনের প্রকৃত সুখ যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা করা বা দেওয়া দয়াভাবের নিয়ম। অন্যান্য জীবনকে দুঃখ দিবার চেষ্টা বা দেওয়াকে ভ্রমবশতঃ সুখ দেওয়ার চেষ্টা করিলাম বা সুখ দিলাম ভাবিয়া সুখী হওয়া দয়াভাবের নিয়ম-বিরুদ্ধ কার্য্য।

মোহান্ত। দেবি। পবিত্রতা-পক্ষাবলম্বীদের মুখে শুনিয়াছি, "অতিথি ভাল কি মন্দ বিবেচনা করা উচিত নয়; যেরূপ অতিথি আসুক না কেন তাহাকে দান করিলে বা আহার করাইলে মনের পবিত্রতা রক্ষা পায়, অতিথিকে মন্দ জানিয়া তাড়াইয়া দিলে নিষ্ঠুরবৃত্তি মনকে ঘেরিয়া ফেলে।"

গৃহস্বামিনী। পূর্ব্বেই এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, দাতার কেন পবিত্রতা থাকে? দাতা মনে করে যে, আমি যাচককে সুখ দিলাম। যদি তাহার মনে উদিত হইত, আমার অর্থ বা আহার দ্বারা যাচকের অপকার করিলাম, তাহা হইলে, তাঁহার মনে দান-জনিত পবিত্র সুখ থাকিত না। যখন অন্যান্য জীবনকে সুখ দেওয়ার চেষ্টা ও দেওয়াই পবিত্রতা, সুতরাং জীবনের সুখ (কারণ পবিত্রতার অপর নাম সুখ), তখন অন্যান্য-দেহস্থ প্রাণের প্রকৃত সুখ যাহাতে হয় তাহা করাই দয়ার নিয়ম। নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য করাই মহাপাপ। যাঁহারা পবিত্রতার পক্ষপাতী হইয়া অন্যের অপকার হইতে দেখিয়াও পূর্ব্বভ্রান্ত-মতের মায়াবশতঃ অপকারকে উপকার ভাবেন, আমি মুক্তকণ্ঠে * বলিতেছি, তাঁহাদের জীবন অন্ধকূপে পড়িয়া থাকে। যখন তাঁহাদের জীবন অন্ধকূপে আশ্রয় করিয়া থাকে, তখন কে তাঁহাদের জীবনে কখনই প্রকৃত পবিত্রতার উদয় হইতে পারে না, একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি। প্রভো। জীবনে অজ্ঞান-ময়লা থাকিতে কি প্রকারে প্রকৃত পবিত্রতার উদয় হইবে?

আপনি পবিত্রতা-পক্ষাবলম্বী হইয়া বলিয়াছেন, অতিথিকে মন্দ জানিয়া তাড়াইয়া দিলে নিষ্ঠুরবৃত্তি মনকে অধিকার করে। তদুত্তরে শুনুন, পরোপকার-বৃত্তিতে উত্তেজিত হইয়া নিষ্ঠুর-বৃত্তিকে আনয়ন করিলেও, স্পর্শ-মণি-সংযোগে লৌহ যেমন স্বর্ণ হইয়া যায়, তদ্রূপ নিষ্ঠুরবৃত্তিও পরোপকার-বৃত্তি-সংযোগে সুন্দর ও শীতল হইয়া যায়।

প্রভো। অর্থ-দান অথবা ভক্ষ্য-পদার্থাদি-দান দয়াবৃত্তির

কার্য্য। প্রেম দেহ, জ্ঞান তাঁহার চক্ষু এবং দয়া সাহস প্রভৃতি বৃত্তিগুলি প্রেমের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। প্রেমের যখন জ্ঞান চক্ষু তখন তিনি অসৎ হইবেন কি প্রকারে? দয়া সতের অঙ্গ, সুতরাং দয়াও সৎ; সতের কার্য্য সৎ বৈ অসৎ হইবে কেন? জ্ঞান দয়ার প্রধান অঙ্গ, সুতরাং জ্ঞান দয়াকে চালনা করিবার একমাত্র অধিকারী। আপনার অঙ্গকে কে ভিন্ন ভাব ভাবে? বা আমি বড়, অমুক ছোট, অমুক ছোট, আমি বড়, এই বিষয় লইয়া গোলমাল করে? বড় হউক, বা ছোট হউক, সর্ব্বাঙ্গকে যখন আমি ভিন্ন অন্য কোন ভাব ভাবিবার নিয়ম নাই, তখন দয়া জ্ঞানকে অপর, বা জ্ঞান দয়াকে অপর কেন ভাবিবে? জ্ঞান আমি জ্ঞানে দয়ার পরিচালক ও দয়া আমি জ্ঞানে চালিত হয়; তবে অজ্ঞান জ্ঞান সাজিয়া দয়াকে চালাইবার কে? অজ্ঞান যখন দয়ার কেহ নয়, তখন দয়া অজ্ঞানের হুকুমে চলিবে কেন? অজ্ঞান কি দয়া উৎপন্ন করে? বা দয়া কি অজ্ঞানের কোন অঙ্গ? যাহাতে যাহার অধিকার নাই, তাহা সে আপনার বেশে অধিকার করিতে পারে না। পররূপ ধরিয়া সে যদি প্রকৃত অধিকারীর অধিকার গ্রহণ করে, তাহা হইলে, সে চোরের কি দণ্ড নাই? তাহার দণ্ড তাহাকে ঘাড়ে ধরিয়া প্রকৃত অধিকারীর অধিকার হইতে বিদায় দেওয়া। ঐ অজ্ঞান-চালক দয়া কি যথার্থ দয়া থাকে? সে কি দয়ার প্রকৃত কার্য্য করিতে পারে?

জ্ঞান-চক্ষু প্রেম, দয়া সাহস ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য নিযুক্ত করেন ও পুনর্ব্বার কার্য্যোদ্ধারের জন্য জ্ঞানও প্রসব করেন; প্রসব করেন বলিলাম কেন? প্রথমে জ্ঞান প্রেম আনয়ন করিলেও প্রেম পুনর্ব্বার জ্ঞান

আনয়ন করেন। মনে করুন, জ্ঞান আপনাকে ভাই বলিয়া আমাকে জানাইল; জানাইবার কারণে আপনাকে আমি প্রেম করিলাম, সুতরাং জ্ঞান হইতে প্রেমোৎপন্ন হইল। প্রেমের কল্যাণে আপনি ও আমি একাত্মা হইয়াছি, এমন সময় আপনার কোন বিপদ হইল, আমি এখন প্রেম, আমি আপনার বিপদ উদ্ধারের জন্য জ্ঞান আনাইবার চেষ্টা করিলাম, ও শেষে চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইয়া আপনাকে উদ্ধার করিলাম। এইখানে দেখুন, প্রেম হইতে পুনর্ব্বার জ্ঞান উৎপন্ন হইল কি না?

শুনিয়াছি, মহাত্মা হানিমানের এক বন্ধু ছিল। ঐ বন্ধুর কঠিন রোগ হইল। তিনি এলোপ্যাথিক প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রের মতে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্ত কোন ক্রমে রোগীকে আরোগ্য করিতে পারিলেন না। এই কারণে তৎকালীন সমস্ত প্রচলিত চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর হানিমানের অবিশ্বাস হইল। যাহাতে লোকের অকালমৃত্যু না ঘটে, তিনি তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই ভূয়সী চেষ্টার ফলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রের আবিষ্কার হইল। এইখানেও দেখুন, প্রেম-বৃত্তিনামক হানিমান হইতে জ্ঞানোৎপন্ন হইল কি না? জ্ঞান প্রেম দয়া ইত্যাদি দ্বারা একটী শরীর গঠিত হইয়াছে। জ্ঞান কখন মস্তিষ্ক এবং প্রেম কখন মস্তিষ্ক হইয়া অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-দিগকে চালনা করেন। উহাঁরা যখন এক, তখন তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া মহাপাপ, এবং উহাঁদের এক এক অঙ্গের প্রশংসা বা নিন্দা করাও মহাপাপ, সমস্ত অঙ্গটী আমাদের পূজনীয়। কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য কেহ মস্তিষ্ক, কেহ হৃদয়, কেহ চক্ষু, কেহ হস্ত, কেহ পদ ইত্যাদি হইয়াছেন।

কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য কোন বৃত্তি হস্ত পদাদি হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার কি নিন্দা করা উচিত? কোন্ ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তি সংসারের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য ভগবানের শূকরমূর্ত্তির নিন্দা করেন? তবে কেন ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও জ্ঞানী ব্যক্তি প্রত্যক্ষ প্রেমেশ্বরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাল মন্দ বিচার করেন? ও কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য নীচাঙ্গকে নিন্দা করেন? যদি হস্তপদাদি না থাকিত তাহা হইলে চক্ষু হৃদয় প্রভৃতি উত্তমাঙ্গের কি দর্শা হইত? এই জন্য আমি প্রেমের অঙ্গ সকলকে সমান ভাবিয়া ভক্তিপুর্ব্বক প্রণাম করি ও এখন করিতেছি।

মোহান্ত। জ্ঞান যখন প্রেম আনয়ন করেন ও প্রেম যখন দয়া ও জ্ঞান আনিয়ন করেন, দয়া যখন সাহস প্রভৃতি বৃত্তি ও পুনর্ব্বার প্রেম আনয়ন করেন, তখন কোন সম্প্রদায় কি করিয়া বলেন "ন্যায় বা নীতিজ্ঞানের উৎপত্তির কারণ এই যে, মানব যখন অভিজ্ঞতা দ্বারা জানিতে পারিল, আমি যদি স্বার্থসিদ্ধির জন্য অমুকের অনিষ্ট করি, তবে অমুক আমার অনিষ্ট করিবে। এই কারণে তাহারা স্বীয় স্বীয় বৃত্তি এরূপ ভাবে চালনা করিতে লাগিল যে, যাহাতে অন্যের অনিষ্ট না হয়। এইখান হইতে ন্যায় বা নীতির উৎপত্তি হইল, এবং পরানিষ্ট করাকে মহাপাপ বলিয়া ঘোষিত হইল।"

দেবি! আপনার কাছে জ্ঞান পাইয়া ন্যায় বা নীতির উদয় সম্বন্ধে আমি তাঁহাদের উক্ত মত অস্বীকার করিয়া বলিতেছি যে, "মানব যখন দেখিতে পাইলেন বা অস্পষ্ট দেখিয়া অনুভব করিলেন, আমরা সকলে এক, তখন তাঁহাদের মধ্যে প্রেম জন্মিল। সেই অবধি পরের ইষ্ট করাকে

তাঁহারা ন্যায় বা নীতি অথবা পুণ্য এবং অনিষ্ট করাকে পাপ বা কুনীতি, অথবা অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সেই অবধি ন্যায় বা নীতি অথবা পুণ্যের সংস্কার উদয় হইল।

দেখুন, মানবের আদিম অবস্থা অথবা শিশু অবস্থা সরলতা-ময়ী। যখন মানব শিশু থাকেন তখন তাঁহারা সম্পূর্ণ সরল; সরলতার সময় মহানুভূতি রাজ্য করে, সুতরাং মানবের আদিম কালে বা শিশু অবস্থায় তাঁহারা যে পরের ইষ্ট করাকে ন্যায় বা নীতি অথবা পুণ্য বলিবেন এবং অনিষ্ট করাকে পাপ, কুনীতি অথবা অন্যায় জানিয়া ঘোষণা করিবেন ইহা স্থির। স্বার্থোৎ-পন্ন-নীতি-বাদীদের মতাপেক্ষা এই মত অধিক যুক্তিসঙ্গত। আমার জ্ঞানে এই মতই সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ, সুতরাং সম্পূর্ণ সত্য।

মহাত্মা বাইবেলরচয়িতাও আদম ও ইভের উপাখ্যানে দেখাইয়াছেন যে "মানবের আদিম অবস্থা সরলতাময়ী, [illegible]-পরে সয়তান (অজ্ঞান) স্বীয় পাপপুত্রকে আনিয়া মানবের সরলতাময় মনোরাজ্যে আশ্রয় দান করে।" আমারও ঐরূপ মত। মানবের শৈশবাবস্থা হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমার ঐ মত দৃঢ় হইয়াছে। কারণ শিশুগণকে আমি পাপশূন্য ও সরল দেখি তাহাদের সহানুভূতি ও তৎপ্রসূত-অনুকরণবৃত্তিকে বলবতী দেখি এবং তৎপরে অজ্ঞান ও অন্যান্য পাপীদের পাপবৃত্তি হইতে তাহাদিগকে পাপী হইতে দেখি, সুতরাং বাইবেলের ঐ মতকে সত্য বলিয়া কেন না বিশ্বাস করিব?

প্রত্যক্ষ করিয়া অনেক ভাবের উদ্রেক হয়। এই কথার প্রমাণের জন্য বলি, যেমন শ্যামকে আপনার মত দেখিয়া রামের

প্রেমভাবের উৎপত্তি হয়। যদি রাম ভ্রমবশতঃ শ্যামকে অন্যের মত দেখে, তবে তাহার অপর ভাবের উদয় হইবে। প্রকৃতিকে সুন্দরী দেখিলে মনে সুন্দর ভাব আসিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

যেমন ভাব দেখা যায়, ভাবপূর্ণ মন ঠিক থাকিলে তাহাতে সেইরূপ ভাবের উদয় হয়। যখন অন্যকে আপন দেখিলে মনে প্রেমভাব ও নীতি ইষ্টানিষ্ট প্রভৃতি প্রেমের আনুসঙ্গিকভাব উদয় হয়, তখন নীতি বা ন্যায় প্রভৃতি পুণ্যভাব মানবের মানসিক স্বতঃসিদ্ধ ভাব না হইবে কেন? উহা যে সুবিধার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে এ কথা স্বার্থোৎপন্ননীতিবাদীরা কি করিয়া বলেন? যখন অমুক দেখিলে অমুক ভাবের উদয় হয়, তখন প্রেমনীতি প্রভৃতি সত্যবৃত্তি পরের নিকট শিক্ষণীয় বা স্বার্থসাধন-কুবৃত্তিজাত একথা কি করিয়া বলিব?

মানব ইহলোক ব্যতীত আর কিছু জানে না, কিন্তু পরলোক, ঈশ্বর ও নরকের ভয়ভাব যদি তাহার মনে উপস্থিত হয়, অথবা নারীকে সুন্দরী দেখিয়াও তাহার মনে সুন্দর ভাব উদিত না হইয়া যদি তৎপরীবর্ত্তে কুভাবের উদ্রেক হয়, তাহা হইলে, তাহাকে শব্দজ্ঞানভাব অর্থাৎ পরের নিকট শিক্ষণীয় ভাব বলিতে পারি। যে বস্তু দেখিলে যে ভাবের উদয় হয়, তাহার বিরুদ্ধ ভাব উদিত হইতে দেখিলে কৃত্রিম ভাব অর্থাৎ কুশিক্ষণীয় ভাব বলিতে পারা যায়, নতুবা বলিতে পারা যায় না; সুতরাং আত্মবৎ-দর্শন-জনিত নীতিভাবকে কৃত্রিম বলিতে পারা যায় না।

পুনশ্চ আমাদের স্বার্থসাধনবৃত্তি সকল দূরদৃষ্টিহীন। দেখুন, এই সত্যসময়েও কাম ক্রোধ হিংসা লোভ প্রভৃতি স্বার্থসাধন-

বৃত্তি সকলের কি দূরদৃষ্টি আছে? কাম ক্রোধ প্রভৃতিতে অন্ধ হইয়া পাণ্ডু, রাবণ, দুর্য্যোধন, মীরজাফর, ওরঙ্গজীব প্রভৃতি কতই মরিল, তবে ইহাদিগকে কি করিয়া দূরদৃষ্টিমান বলিব? যাহারা স্বয়ং দূরদর্শী নয়, তাহারা কি করিয়া আপনাপন মঙ্গলের জন্ম ন্যায় বা নীতি-বৃত্তি সৃজন করিবে?

নীতি বা ন্যায় প্রেম বা পরোপকারেচ্ছা যে অজ্ঞানোৎপন্ন কৃত্রিম অন্ধ শিক্ষণীয় বৃত্তি নয়, মহাত্মা প্রভু ক্রাইষ্ট তাহার একটী প্রমাণ। দেখুন, খৃষ্ট যখন সংসারের দিকে চাইলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন, সংসার নররুধিরে প্লাবিত হই-তেছে। ইহা দেখিয়া পরের অনিষ্টকরা মন্দ ও পরের ইষ্ট করা ভাল এই নীতি তাঁহার হৃদয়ে স্বতই উদিত হইল। যাঁহারা নীতিকে কুবৃত্তিশালি-মানবের সৃষ্ট বলেন, তাঁহারা দেখুন, ঐ ভাব কৃত্রিম বা অকৃত্রিম।

শিশু ভ্রমবশতঃ জলকে স্থল জ্ঞান করে, তাহার পর বয়ো-বৃদ্ধি সহকারে জ্ঞান দ্বারা জলকে জল এবং স্থলকে স্থল বলিয়া জানে। অজ্ঞ শিশু প্রথমে জলকে স্থল জ্ঞান করিয়াছিল বলিয়া ঐ শিশু যখন কাল সহকারে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার কি উচিত, আদি ভ্রমজ্ঞানকে সহজাত জ্ঞান বলিয়া পালন করা? এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে সত্য জ্ঞানকে উপেক্ষা করা? জ্ঞানই আত্মার ধর্ম্ম, অজ্ঞানই আত্মার অধর্ম্ম, ইহা নিশ্চয় জানিয়া সকল মনুষ্যে জ্ঞানকে আপন বস্তু বলিয়া গ্রহণ করা সত্যের অনু-মোদিত। আমার ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, মানবের আদি-মাবস্থায় স্বার্থ-সাধনবৃত্তি দ্বারা নীতি উৎপন্ন হইলেও (যাহা আমি স্বীকার করি না) তাহা পালন করা কর্ত্তব্য নয়; কারণ তাহা-

আত্মার অধর্ম্ম। সে যাহা হউক, অতিথি দ্বারা সমাজের কি অনিষ্ট হয়, তাহা আপনার নিকট হইতে শুনিতে চাই।

গৃহস্বামিনী। মনে করুন, একটী দেশে সহস্র লোক আছে; তন্মধ্যে যদি ২০০ শত লোক অলস হয়, তাহা হইলে সমাজের কি বলক্ষয় ও আয়ক্ষয় হইবে না? অবশ্য হইবে। কোন সচ্চরিত্র অর্জ্জনশীল লোকের যতক্ষণ কোন অলস লোক গলগ্রহ না হয়, ততক্ষণ তিনি আপনার ও স্বদেশের সম্পূর্ণ উন্নতিসাধন করিতে পারেন, কিন্তু কোন অলস ব্যক্তি তাঁহার গলগ্রহ হইলে, তাঁহার উন্নতির ব্যাঘাত হয়। যে ব্যক্তি গলগ্রহ হয়, সে অজ্ঞান বশতঃ আপনার শরীরের ও মনের সম্পূর্ণ অনিষ্ট সাধন করে। তাহার কারণ পূর্ব্বেই একপ্রকার বলা হইয়াছে। আবার সেই কথা প্রকারান্তরে বলা যাইতেছে। মন ও শরীর চালনা না করিলে মন ও শরীরের জীবন থাকিয়াও যেন থাকে না, কারণ জড় শক্র আসিয়া উহাদিগকে গ্রাস করে। এইরূপ একটী সমাজের কতকগুলি লোক শক্তি থাকিতেও বিনা কারণে সমাজের গলগ্রহ হইলে সমাজের আর উন্নতি হয় না, বরং সম্পূর্ণ অধোগতি হয়।

প্রভো। অধিকাংশ মানবের মন অজ্ঞানে জড়িত, তজ্জন্য তাহারা সুবিধা পাইলেই কুপথে গমন করে।

যদি সমাজে এরূপ নিয়ম চলিত থাকে যে, যেপ্রকার অতিথি হউক না কেন, তাহাকে দান করিতে বা আহার দিতে হইবে, তাহা হইলে অধিকাংশ লোক "পরিশ্রম না করিলেও খাইতে পাইব" এই ভাবিয়া পরিশ্রমবিমুখ হইয়া মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া

থাকিবে এবং সমাজের ধ্বংসপথ পরিষ্কৃত হইবার জন্ত গৌণে বা অগৌণে ধ্বংস হইবে।

মোহান্ত। একথা বুঝিলাম। দেবি! সমাজ ধ্বংস হউক আর যাহা হউক তাহাতে ধর্ম্মের কি? যাহারা অধার্ম্মিক, কেবল ইহলোক লইয়া সমাজ সমাজ করিয়া মরে, তাহারাই সমাজ দেখিবে। সমাজের ভার ধর্ম্মের নয়, ঈশ্বরোপসনা করাই ধর্ম্মের কার্য্য। ঈশ্বরোপসনায় আমাদের উপকার আছে। উহাতে যখন উপকার আছে, তখন ঈশ্বরোপসনা করিব না কেন? এবং তোমা হেন ধার্ম্মিকার সাহায্য পাইব না কেন?

গৃহস্বামিনীর নাম শুনিলাম প্রতিভা। এইবার হইতে গৃহ-স্বামিনীকে প্রতিভা বলিয়া ডাকিব।

প্রতিভা। যাঁহারা মানব-সমাজের অন্তর্গত হইয়া মানব-সমাজের হিতাহিতের দিকে লক্ষ্য না করেন, তাঁহারা আত্মদ্রোহী মহাপাপী। তাঁহাদিগকে আত্মদ্রোহী মহাপাপী বলি কেন? সমাজই মানবের সম্পূর্ণ আত্মা। বিবিধ শস্ত, লবণ, তৈল, শীত-বস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি অসংখ্য উপকরণ যদি আমরা সমাজ হইতে না পাইতাম, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যেক দেহস্থ আত্মা থাকিত না। সমাজের সহিত যদি আমাদের আত্মা না মিলিত, তাহা হইলে, প্রেম দয়া প্রভৃতি আত্মা বিকাশ পাইত না, সুতরাং আত্মা থাকিয়াও থাকিত না। একদেহস্থ আত্মা সমস্তদেহস্থ আত্মার সহিত ও আত্মোপকরণ ভৌতিক পদার্থের সহিত মিশিলে তিনি সম্পূর্ণতা লাভ করেন, সুতরাং সমাজ না থাকিলে আমাদের আত্মা সম্পূর্ণতা লাভ করিতেও পারে না। এই সমস্ত দেখিয়া বলি, সমাজও যাহা, আত্মাও তাহা।

যিনি ঈদৃশ সমাজকে অবহেলা করিয়া অনিষ্ট করেন, তিনি আত্মদ্রোহী মহাপাপী। তাহা বলিষা মনে করিবেন না যে, আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নাই, আমরা কেবল সমাজের অধীন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লইয়াই সমাজ থাকে। আপনাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা না থাকিবার কারণ আপনাদিগকে সমাজধ্বংসী বলিতেছি। প্রভো। আপনারা যখন সমাজের হিতাহিতের দিকে লক্ষ্য না করেন, তখন সমাজ আপনাদিগকে আহার যোগাই-বার জন্য দায়ী হইতে পারে না, বরং আপনাদিগকে সমাজের পাপ বিবেচনা করিয়া সমাজ হইতে তাড়িত বা ধ্বংস করা সমাজের অবশ্য করণীয়। ধ্বংস বলিলে আপনাদিগকে একবারে হত্যা করা বলিতেছি না, আপনাদিগের পাপ্‌বুদ্ধির ধ্বংসের কথা বলিতেছি। আপনাদের পাপ (যাহা এখন আপনারা) ধ্বংস হইলে আপনাদের আত্মা নির্ম্মল হইয়া উদিত হইবে। আপনাদিগের পাপধ্বংসের জন্য আপনাদিগকে সমাজ হইতে সরাইয়া আত্ম-সংশোধক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া সমাজের অবশ্য করণীয়। আপনাদের আত্মাংশ-সমূহকে সুতরাং আত্মাকে পাপ হইতে মুক্ত না করা সমাজের আত্মহত্যা-মহাপাপ, সুতরাং পাপগ্রস্ত লোকদিগকে উদ্ধার না করিলে সমাজকে ও প্রত্যেক-দেহস্থ আত্মাকেও আত্মহত্যা-মহাপাপে থাকিতে হয়। এই মহাপাপ ক্রমে ক্রমে সমাজ ধ্বংস করিয়া ফেলে, সুতরাং আপনাদের মহাপাপ ধ্বংস করা সমাজের প্রত্যেকদেহস্থ আত্মারই কর্ত্তব্য, কেবল কর্ত্তব্য কেন না, করিলে নয়। পাপ ধ্বংস করাই আপনা-দের উপকার। আহার বা অর্থদান দ্বারা আপনাদের উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রভো! এক দিক দেখিবেন না।

সমাজকে আমাদের প্রাণ বলিবার কারণ সমাজকে একটা অপর বস্তু খাড়া করিয়া আমাদিগকে সমাজের অধীন ভাবিবেন না। আমাদিগকে লইয়া সমাজ। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে অর্থ দেয় বলিয়া সমাজের নিকট লবণ তৈলাদি পায়, সুতরাং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যায় না। উভয় দিক্ দেখিলে সমাজ ও প্রাণ এক।

প্রভো! আপনি বলিলেন, ধর্ম্ম সমাজের কেহ নয়। ধর্ম্ম যদি সমাজের কেহ নয়, তাহা হইলে সমাজও ধর্ম্মের কেহ হইতে পারে না। ধর্ম্মকে তাড়াইতে বা ধ্বংস করিতে সমাজ বাধ্য। যে ধর্ম্ম সমাজের হিতের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, সে ধর্ম্ম সমাজে থাকিতে পারে না, এবং সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়, তাহার অস্তিত্ব অস্থায়ী। আমি জানি, ঈশ্বর যিনি, তাঁহাকে আপনারা, কেবল আপনারা কেন—আস্তিকমাত্রেই জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া বিশ্বাস করেন। যিনি জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তিনি জগতের মঙ্গল কার্য্য করিতে দেখিলে আমাদিগকে ভাল বাসিবেন। তিনি আপনার পুত্রদিগকে আপনাদের কার্য্য দ্বারা আপনাদের অমঙ্গল করিতে দেখিযা কি সন্তুষ্ট হইতে পাবেন? কখনই হইতে পারেন না। ঈশ্বর যদি জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন, যে পথে চলিলে জীবের মঙ্গল হয়, সেই সকল পথে চলা তাঁহার অনুমোদিত ও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নিযম হইয়া উঠে। তাঁহার আজ্ঞা পালন না করিয়া অর্থাৎ জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর অনুমোদিত পরোপকার-রূপ মঙ্গলপথে না চলিয়া কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া ডাকিলে বা অর্চ্চনা করিলে তিনি কখন সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। নিশ্চয় জানিবেন, পরোপকার রূপ পথে চলা আমাদের অশেষ মঙ্গল। মনে করুন, আপনি ঈশ্বরের ন্যায়

পরোপকারী। একজন দরিদ্রের দুঃখে দয়ার্দ্র হইয়া আপনি যেমন আমার ও দরিদ্রের মঙ্গলের জন্য আমাকে বলিলেন, প্রতিভা। ঐ ব্যক্তির আহারের উদ্যোগ করিয়া দেও। আমি যদি দরিদ্রের আহারের উদ্যোগ করিয়া না দিয়া কেবল আপনার খোষামোদ করি, তাহা হইলে, আপনি কি আমার প্রতি রাগ করিবেন না? আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কি আমাকে পুরস্কার করিবেন? যে পথ আপনার অনুমোদিত নয়, কারণ যে পথে আমার অশেষ অমঙ্গল-শত্রু রহিয়াছে, সেই পথে যদি আমি যাই, তাহা হইলে, আপনি কি ক্রোধ করিবেন না? অবশ্য করিবেন, কারণ আপনি পরোপকারী। যিনি পরোপকারী, তিনি প্রশংসা প্রভৃতি আপনার স্বার্থমাত্রকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করেন। তিনি কেবল পরোপকাররূপ মঙ্গল-পথে চলিতে দেখিলে সন্তুষ্ট হয়েন। এই যুক্তি অনুসারে যাঁহারা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ঈশ্বরের কেবল গুণকীর্ত্তন করেন ও মন প্রাণ ঐক্য করিয়া ভাবেন, অথচ পরোপকার-রূপ পথে চালিত হন না, তাঁহারা অবশ্য ঈশ্বরের ক্রোধের ভাজন হইবেন। দণ্ডদাতা ঈশ্বর তাঁহাদিগকে অবশ্য দণ্ড দিতে পারেন। আপনার মতে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করাই যদি ধর্ম্ম হয়, ঈশ্বরোপসনা প্রভৃতি নিষ্ফল কার্য্য দ্বারা তাহা হয় না, মঙ্গলময় পরোপকার-রূপ পথে চলিলে তাহা হয়। দেখুন, এই যুক্তিতে আপনার ধর্ম্ম উড়িয়া যাইতেছে কি না? এবং আপনারা কেবল দণ্ডের কারণ হইতেছেন কি না?

মোহান্ত। উত্তম কথা, যদি আমরা পাপ করি, ঈশ্বর আমাদিগকে দণ্ড দিবেন, মানবসমাজ দণ্ড দিবার কে?

প্রতিভা। আপনার কথানুসারেই মঙ্গলময় ঈশ্বর স্বীকার করিয়া দেখাইলাম যে, পরোপকাররূপ পথে না চলিলে তিনি সন্তুষ্ট হয়েন না, নতুবা ঈশ্বরসম্বন্ধে আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই এবং ঈশ্বরসম্বন্ধে কোন বিচার করিতেছি না, কেবল সমাজসম্বন্ধে কথা কহিতেছি। কথাপ্রসঙ্গে সমাজের মঙ্গল ও অমঙ্গল যাহা পড়িতেছে তাহাই বিবৃত হইতেছে। ঈশ্বর যদি সমাজের অমঙ্গল পদার্থ হন, তাহা হইলে সত্যের অনুরোধে বিবৃত করিতে হইবে। তজ্জন্য বলিতে হইতেছে যে, পাপীর দণ্ডভার ঈশ্বরে অর্পণ করিলে সমাজ উৎসন্ন হইয়া যাইবেক, কারণ তিনি অপ্রত্যক্ষ, সুতরাং তাঁহার দণ্ডও অপ্রত্যক্ষ। এই অপ্রত্যক্ষ কারণে আমি দেখিতে পাই, পাপী তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) মুখে স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ স্বীকার করে না। মানবের শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দেওয়াই পাপীর কার্য্য, সুতরাং পাপীকে দণ্ড দেওয়া মানবসমাজের অবশ্য করণীয় হইয়া উঠে। দণ্ড দ্বারা পাপ হ্রাসতা প্রাপ্ত হয়। এই কারণে পাপীকে দণ্ড দেওয়া উচিত।

মোহান্ত। দেবি। আপনি যে যে মত বলিলেন, এ মতের কোন কোন মত ইংরাজের চর্ব্বিতচর্ব্বণমাত্র। ইংলণ্ডবাসীদের যে মত তাহা ভারতবাসীদের হইতে পারে না।

প্রতিভা। প্রভো। আমি জানি না ঐ মত ইংরাজের কি না, কারণ আমি মূর্খ স্ত্রীলোক। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, সত্য কি ইয়োরোপীয়দের একচেটিয়া? কখনই নয়, তবে আপনি ইহার কোন কোন মত ইংরাজের চর্ব্বিতচর্ব্বণ বলিতে পারেন না। প্রভো! আমি মূর্খ স্ত্রীলোক, ইয়োরোপীয় কোন

ভাষা জানি না, কেবল স্বামীর কল্যাণে স্বাধীন-চিন্তা-শক্তি পাইয়া উক্ত সকল মত জানিতে পারিয়াছি। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, সত্য সকলেরই চিন্তালব্ধ। ইয়োরোপীয়দের অনেক মত বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহা বলিয়া আমি বলিতে চাই না যে, পাশ্চত্য মত যাহা ভারতবর্ষে পূর্ব্বে আবিষ্কার হইয়াছিল তাহা ইংরাজদের আবিষ্কৃত নয়। কারণ ভারতবর্ষীয়েরা যেরূপপ্রকৃতি বা মানব ও অন্যান্য জীবপ্রকৃতির কোল হইতে সত্য (কারণ উহাই সত্য-স্থান) আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, ইয়োরোপীয়েরা সেইরূপ করিয়াছেন, তবে ইয়োরোপীয়েরা ভারতবর্ষীয়দের মতাবলম্বী হইবেন কেন? অগ্রে আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে কি প্রাধান্য দিতে হইবে? "প্রকৃতি" ভারতবর্ষীয়দিগকে অগ্রে জন্মাইয়া বা অবস্থায় ফেলাইয়া সত্য আবিষ্কারের সময় তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ইয়োরোপীয়দিগকে ঐরূপ করিলে উহাঁরাও ঐরূপ করিতে পারিতেন, অবস্থা হইতে সত্যোৎপত্তি হয়। ভারতবর্ষীয়েরা অগ্রে অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, সুতরাং তাহাতে তাঁহাদের প্রাধান্য কিসের?

আপনি বলিলেন, ইংরাজের সত্য এদেশে খাটিতে পারে না। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ইংরাজ বা ভারতবর্ষীয়াপেক্ষা পূর্ব্বতন জাতিরা আহার করে বলিয়া ভারতবর্ষীয়রা কি আহার করিবে না? "জীবনদায়ক পদার্থ আহার করিলে জীবন রক্ষা পায়" এ সত্য কি সকল দেশে সমান নয়? যখন ঐ সত্য সকল দেশের সত্য ভাবিয়া সকল জাতি এবং আপনারাও আহার করেন, তখন আপনার ও আপনার মতাবলম্বীদের ভাবা উচিত,

আমি যে সত্য বলিলাম, ঐ সত্য আমাদের উপযোগী কি না। যদি উহা আমাদের উপযোগী বিবেচনা করেন তাহা আপনাদের সত্য ভাবিয়া ব্যবহার করিবেন না কেন?

আপনি অতিথিসম্বন্ধীয় যেসত্য ইংরাজদের আবিষ্কার ভাবিতেছেন তাহা, অসংখ্য হিন্দুগ্রন্থের মধ্যে কোন না কোন গ্রন্থে বিকাশ থাকিতে পারে, যদি না থাকে, এদেশে ইংরাজি মত প্রবেশ না করিলেও একদিন না একদিন উহা বিকাশ হইত, কারণ ঐ সত্য ভারতবর্ষীয়দেরও জীবনোপযোগী। যখন অধিকাংশ লোক শক্তি থাকিতেও অতিথিবৃত্তি অবলম্বন করিবার কারণ সমাজ অধঃপাতে যাইত, তখন ঐ সত্য আবিষ্কারের সময়। দেখা যায়, যখন যে সমাজ যে বিপদে পড়িয়াছে, সেই সময় সেই বিপদুদ্ধারের সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। তজ্জন্য বলিতেছি যে, সমাজের অধিকাংশ লোক অতিথি হইলে ঐ সত্য আবিষ্কৃত হইত। যদি ঐ সত্য আবিষ্কৃত না হইত, তাহা হইলে, সমাজ জীবনদায়ক-উক্ত-সত্যাভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত-হইত, কারণ ঐ সত্য সমাজের জীবনস্বরূপ ও প্রকৃত উপযোগী।

মোহান্ত। ভাবিয়া দেখিলাম, ইংরাজ ও অন্যান্য বৈদেশিকদের মূল সত্য সকল যখন ভারতবর্ষীয়দের মূল সত্য সকলের সহিত এক হইল, তখন সকল জাতি কি এক? ইংরাজ ও অন্যান্য বৈদেশিকদিগের মানসিক গুণের সহিত যখন ভারতবর্ষীয়দের মানসিক গুণের ঐক্য হইতেছে তখন সকলে কেন না একজাতীয় হয়?

প্রতিভা। প্রকৃতির যে যে উপকরণে ভারতবর্ষীয়েরা গর্বিত হইয়াছে, ইংলণ্ডীয় ও অন্যান্য বৈদেশিকেরাও যদি সেই সেই

ভৌতিক উপকরণে গঠিত না হইত তাহা হইলে, তাহারা ভারত-বর্ষীয়দের হইতে এক স্বতন্ত্র জীব হইত। অর্থাৎ তাহারা ভারত-বর্ষীয়দিগের মত মানবাকার হইত না এবং তাহাদের দয়া সাহস প্রেম ইত্যাদি কোন গুণ থাকিত না, সুতরাং তাঁহাদের আত্মার সহিত ভারতবর্ষীয়দিগের আত্মার কোনপ্রকার সাদৃশ্য থাকিত না। ইংলণ্ড প্রভৃতি বৈদেশিকদিগেব আত্মার সহিত ভারত-বর্ষীয়দিগের আত্মার সাদৃশ্য দেখিয়া "তাঁহারা সকলে যে এক" ইহা প্রত্যক্ষ বুঝা যাইতেছে।

প্রভো! আপনি বলিতে পারেন "তবে পরস্পরের বর্ণের, আহারের ও পরিচ্ছদের পার্থক্য কেন?" ইহার কারণ এই, বৈদেশিক ভুমিতে কোন কোন ভৌতিক পদার্থের (যেমন শৈত্য, বা তাপের) প্রভাব বেশী বা কম, ভারতবর্ষে সেই সমস্ত ভৌতিক পদার্থ আছে, তবে বেশী বা কম। সেই কারণেই আমাদের সহিত তাহাদের পরিচ্ছদাদির বিভিন্নতা অল্পপরি-মাণে লক্ষিত হয, কিন্তু এক হিসাবে প্রকৃতির যে যে উপকরণ-ভাগে মানবের শরীর ও প্রাণ রয়, সেই সেই উপকরণভাগে সর্ব্বদেশীয মানবের শরীর ও প্রাণ রহিয়াছে। প্রকৃতির যে যে উপকরণ-ভাগে ভারতবর্ষীযদেব শরীর ও প্রাণ থাকে, অন্যান্ত বৈদেশীয়দের সেই সেই উপকরণ-ভাগে শরীর ও প্রাণ থাকে। দেখুন, ইংলণ্ডবাসীদিগের শৈত্যনামক ভৌতিক উপকরণ বেশী এবং তাপ উপকরণ অল্প, এজন্য ইংলণ্ডবাসী-দিগকে কৃত্রিম উপায়ে অর্থাৎ তাপপূর্ণ পরিচ্ছদ, ভক্ষ্য দ্রব্য ও পানীয় দ্বারা অন্যান্য দেশের মানবের প্রাণ যতপরিমাণ তাপে রক্ষা হয়, সেই পরিমাণের তাপ কৃত্রিম উপায়ে শরীরে রক্ষা

করিতে হয়। এই কারণে ইংলণ্ডবাসীদের পরিচ্ছদ, আহার ও পানীয় ভারতবর্ষীয়দিগের হইতে প্রভেদ। 'ইংলণ্ড" অল্পপরিমাণে তাপ দেয় বলিয়া অর্থাৎ সেখানকার প্রকৃতি স্বেচ্ছায় তাপ দেয় না বলিয়া ইংলণ্ডবাসীদিগকে তাপপূর্ণ পরিচ্ছদাদি দ্বারা তাপ লইতে হয়। আবও দেখুন, ভারতবর্ষ তাপপ্রধান দেশ, এখানে শৈত্যের ভাগ কম, এই কাবণে ভারতবর্ষীয়দিগকে স্নানাহার প্রভৃতি দ্বারা প্রকৃতির শৈত্য-উপকবণ (যতটুকু শৈত্য-উপকরণে প্রাণ থাকে) শরীরে আনয়ন কবিতে হয়। ইহা দেখিয়া বলিতেছি, প্রকৃতির যে যে উপকরণের ভাগ দ্বারা ভারতবর্ষীয়দের প্রাণ স্থষ্ট হইয়াছে ও রহিয়াছে, সেই সেই উপকরণের ভাগ দ্বারা সর্ব্বদেশীয় মানবেব প্রাণ স্থষ্ট হইযাছে ও রহিয়াছে।

মোহান্ত। দেবি। আমরা যদি সকলে এক হইলাম, তবে ইংরাজ ও মুসলমান প্রভৃতি গোখাদকদের সহিত একত্রে আহার করিব কি?

প্রতিভা। ইংবাজ ও মুসলমান প্রভৃতি সকলে একজাতীয় হইলেও ইংরাজ ও মুসলমানদের দোষ সকল আমাদের বা তাঁহাদের কেহ নয। তাহাদিগকে সকলেব শত্রু ভাবিয়া ধ্বংস করা সকলের অবশ্য করণীয়। এই জ্ঞানের হিসাবে ইংরাজ ও মুসলমান প্রভৃতি গোখাদকদের গোহত্যা-দোষ গোরক্ষক পুণ্যাত্মাদের উচিত নয় যে, ঐ পাপের প্রশ্রয় দেওয়া অর্থাৎ তাঁহাদের উক্ত দোষকে ঘৃণা না করিয়া তাঁহাদের সহিত একত্রে আহার করা। ইংরাজ ও মুসলমান প্রভৃতি গোখাদকদেরও উচিত নয় যে, গোরক্ষক পুণ্যাত্মারা মাতৃপিতৃসম গোকুল ধ্বংস

করিবার জন্য তাঁহাদিগকে ঘৃণা করেন বলিয়া ঐ পুণ্যাত্মা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতাদিগের উপর ক্রোধ করা বা ভ্রমে কুসংস্কারাপন্ন ভাবিয়া তাঁহাদের কথা তাচ্ছল্য করা। যেরূপ লোক যেরূপ কথা বলুক না কেন, তাহা সার কি অসার ভাবা উচিত। ইহাতে আমাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়া সত্যালোকে আলোকিত হয়। পাপকে ঘৃণা করিলে পাপ আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না, বিমলচন্দ্রের ন্যায় আত্মা বিকাশ পাইয়া থাকে এবং আত্ম-শক্র পাপ হ্রাসতা প্রাপ্ত হয়। এই এই কারণে গোরক্ষক পুণ্যাত্মারা গোখাদকদিগকে ঘৃণা করেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গোরক্ষ ভ্রাতাদিগের উপর কি ক্রোধ করা বা তাঁহাদিগকে মূর্খ ভাবা উচিত?

ভাই প্রমদাচরণ। অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে, শরীর নিদ্রাবেশে অলস হইতেছে। অতএব বারান্তরে এই ঘটনার অবশিষ্টাংশ বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

তোমার

শ্রীসরোজকুমার বসু।

তৃতীয় পত্র (পীড়িতা-লিখিত)।

ভাই! তোমার স্বাধীন-চিন্তা-বিষয়ক পত্রখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। যতদিন ভারতে স্বাধীন-চিন্তা-শক্তি ছিল, ততদিন কপিল গৌতম প্রভৃতির ন্যায় দর্শনকার, ভাস্করাচার্য্য বরাহ প্রভৃতির ন্যায় জ্যোতির্ব্বিদ, মনু পরাশর প্রভৃতির ন্যায় স্মৃতিকার, উভয়ভারতী লীলাবতী প্রভৃতির ন্যায় রমণীরত্ন, বাল্মীকি ব্যাস প্রভৃতির ন্যায় কবি, সুশ্রুত বাগ্‌ভট প্রভৃতির ন্যায় চিকিৎসা-শাস্ত্রচয়িতা, পাতঞ্জল বশিষ্ঠ প্রভৃতির ন্যায় যোগ-শাস্ত্র-প্রণেতা প্রভৃতি কতই বত্ন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উহাঁদের দ্বারা জ্ঞানজগতে কতই অমূল্য জ্ঞানরত্ন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ভ্রম-বশতঃ যখন ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে নরদেবতা করিবার আশায় ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রজাতিদিগকে জ্ঞানচর্চ্চা হইতে রহিত করিলেন, শাস্ত্রবিরুদ্ধকথাকে মহাপাপ, শাস্ত্রচয়িতাদিগকে দেবতা, অন্যদিগকে মানব ও আপনাদিগকে দেবপুত্র বলিয়া প্রচার করিলেন, সেইদিন হইতে ভারতে চিন্তা-শক্তি লুপ্ত হইল, এবং তাহাদের মায়াজালে বদ্ধ হইয়া তদীয় বংশজগণও জড় হইয়া রহিল। আমি দেখিয়াছি, একজন লোভী ব্রাহ্মণ স্বয়ং কৃত্রিম জানিয়াও কেবল অর্থলাভাশায় একটা মুড়িকে জাগ্রত দেবতা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বংশজগণ ঐ মুড়িকে সত্য সত্যই দেবতা বলিয়া ভয়, ভক্তি ও উপাসনা করিত।

আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান স্বাধীন-চিন্তার জনক ও স্বাধীন-চিন্তা জীবনের পরিচায়ক। আত্মহীনতা-জ্ঞান স্বাধীন-চিন্তা-লোপের জনক এবং লুপ্ত-স্বাধীন-চিন্তা মানবের জীবন্মৃত্যুর পরিচায়ক; সুতরাং সকলে ব্রাহ্মণগণ হইতে আত্মহীনতাজ্ঞান পাইয়া বাচিয়াও মরিয়া রহিল। পূর্ব্বপুরুষদিগের আদেশ ঘোষণা করিবার কারণে কেবল ব্রাহ্মণপুত্রেরা দেবপুত্র বলিয়া এবং আপনাদিগকে দেবরচিত শাস্ত্র সকলের অধিকারী বলিয়া অপর তিন জাতির নিকট দেবভাবে পূজনীয় হইতে লাগিল এবং সকলে ক্ষীণ-বুদ্ধি হওয়াতে শাস্ত্ররচয়িতা, শাস্ত্রজ্ঞ, বায়ু, সলিল প্রভৃতি অসংখ্য পদার্থ দেবভাবে তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইতে লাগিল। ঐপ্রকার হওয়া নিয়ম। কারণ অল্পশক্তি ব্যক্তি মহাশক্তি দেখিলেই তাহাকে দেব ভাবিয়া মাথা নোয়াইবে। মানবের শক্তি যত বিকাশ হইতে থাকে, ততই তাহার নিকট হইতে দেবগুলি একে একে অন্তর্হিত হইতে থাকে। অল্পবিকশিত-শক্তি মানবের মন হইতে প্রথমে অতি ক্ষুদ্র দেব অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ করে, শক্তিবিকাশের সহ ক্ষুদ্রের পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেব-গুলি অন্তর্হিত হইতে থাকে এবং যখন মানবের মনে শক্তি সম্পূর্ণ বিকাশ হয়, তখন সর্ব্বোপরি দেব অদৃশ্য হইয়া থাকে। শক্তিবিকাশের সহিত যেমন দেবগুলি ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া পড়ে, সেইপ্রকার শক্তিহীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেবগুলি আবির্ভূত হইয়া পড়ে। ইহা মনো-জগতের নিয়ম। ঐ নিয়ম জানিয়া ব্রাহ্মণগণ সকলকে ক্ষীণশক্তি করিয়াছিলেন।

ভাই। ভাবিবে না যে, আমি নাস্তিকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য উহা লিখিলাম। মনোজগতের নিয়ম দেখিয়া কথাপ্রসঙ্গে

উহা না লিখিলে নয় বলিয়া লিখিলাম। প্রতিজ্ঞা করিয়া জ্ঞানালোচনা করিতেছি। জ্ঞানালোচনা করিতে করিতে আস্তিকতা-স্থাপন বা নাস্তিকতা-উচ্ছেদ, নাস্তিকতা-স্থাপন বা আস্তিকতা-উচ্ছেদ হয় হউক, আমি সে দিকে লক্ষ্য করিব না। যাহা হউক আমি সুশক্তিকে কোটী কোটী নমস্কার করি। শক্তিই সমস্ত দুঃখ হইতে লোককে মুক্ত করেন, শক্তিই মুক্তি। অজ্ঞনাচ্ছন্ন জগৎ হইতে শক্তি ভিন্ন লোক মুক্তি হইবে কি প্রকারে? এমন শক্তিকে যাঁহারা নিন্দা করেন, তাঁহাদিগকে আমি মহাপাপী বলিয়া ঘৃণা করি, এবং ঘৃণা করিতে সকলকে অনুরোধ করি। আমার এই কথাতে হয়ত শক্তি উপাসনা-দ্বেষীরা শক্তির গুণকীর্ত্তন শুনিযা ভ্রমবশতঃ জ্বলিয়া উঠিবেন, কারণ শক্তিমাত্রকে তাঁহারা মন্দ বলিয়া জানেন। এক্ষণে এই কথা রাখিয়া বলি, আমি একটী স্ত্রীলোকের পত্র পাইয়াছি, তোমার পাঠার্থে তাহা অবিকল লিখিয়া তোমার নিকট পাঠাইলাম।

বাল্য সুহৃদ্। তুমি কি আমাকে ভুলিয়াগিয়াছ? সরলতাময় বাল্যকালের সেই ধূলাখেলা, লুকাচুরিখেলা, পাখী, কুকুর ও ফড়িং প্রভৃতি জীবপোষা ইত্যাদি আমোদজনক কার্য্যের সঙ্গিনীকে তুমি কি ভুলিয়াগিয়াছ? বোধ হয়, তুমি অনেকের মত বাল্যকালের সেই আমোদজনক কার্য্যগুলিকে মূল্যশূন্য ভাবিয়া বিজ্ঞ হইয়াছ। অত্মসুখদায়ক কার্য্যগুলিকে যাঁহারা মূল্যহীন ভাবেন, তাঁহাদের বিজ্ঞতাকে আমি প্রশংসা করিতে লজ্জিত হই। আমার জ্ঞানে যে কার্য্যে আত্মসুখ লাভ হয়, তাহাই মানবের কার্য্য, তাহাই মানবের করণীয় এবং যে কার্য্যে

আত্মসুখলাভ না হয়, তাহাই মূল্যহীন, তাহাই মানবের অকার্য্য, তাহাই মানবের বর্জ্জনীয়। সে যাহা হউক, তুমি শুন আর না শুন, তোমাকে বাল্যবন্ধু ভাবিয়া আমি আজি তোমার নিকট আপনার দুঃখের কথা পাড়িতেছি। দুঃখ প্রকাশ করিলে দুঃখের প্রকোপতা হ্রাস হইয়া যায়, এই কারণে আমি তোমার নিকট দুঃখের কথা বলিতে বসিলাম।

ভাই! বিবাহের বহুদিন পরে যে দিন তোমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া শ্বশুরবাড়ী আসিলাম, সেই দিনই আমার সুখের দিন গত হইয়া দুঃখের রাত্রি উপস্থিত হইল। বিবাহ-কালে আমি স্বামীকে বৃদ্ধ দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তখন জানি না যে ঐ বৃদ্ধই আমার জীবনের সহচর হইবেন। যিনি পিতার তুল্য, তাঁহাকে স্বামী বলিয়া ভাবিতে হইবে, ইহা আমি তখন বুঝিতে পারি নাই, জানিলে এইরূপ আকস্মিক দুঃখে আক্রান্তা হইব কেন?

সপ্তদশ-বর্ষবয়স্কা যুবতীর ষাটি-বর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ স্বামী দেখিয়া আমি কাঁদিলাম, অবশেষে কপালের বিধি খণ্ডাইবার নয় ভাবিয়া বৃদ্ধ স্বামীর সহিত মন মিলাইতে বহু চেষ্টা করিলাম; কিন্তু হায় কিছুতেই মন মিলিল না। অবাধ্য মনকে বাধ্য করিবার জন্য আমি পতিভক্তিহীনার শাস্ত্রোক্ত শাসন সকল সর্ব্বদা স্মরণ করিতে ও সময়ে সময়ে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। বহুদিন ঐপ্রকার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মন কিছুতেই বাধ্য হইয়া স্বামীর সহিত মিলিল না, পরিশেষে পরাস্ত হইয়া ভাবিলাম, ঈশ্বর আসিলেও অন্তর ও বহির্জ্জগতের নিয়ম বলপূর্ব্বক ভাঙ্গিতে পারেন না। স্বামী বৃদ্ধ, অশেষগুণশালী, তাঁহাকে

আমি ভক্তি করিতে পারি, কিন্তু প্রেম (পরস্পর সমভাব থাকিলে যে ভাব জন্মে) করিতে পারি না। স্বামীর সহিত আমার প্রেম হইল না। এইপ্রকার ভাবে দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

একটী নদীর পশ্চিমদিকের বাঁধের উপর আমার শ্বশুরবাড়ী। তাহার বিপরীতদিকের বাঁধের উপর একদিন অপরাহ্নে আমি একটী যুবককে বেড়াইতে দেখিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহার মনটী যেন আমার মনের মত। বোধ হয়, যুবকও আমাকে দেখিয়া ভাবিতেছিলেন, তাঁহার মনের মত আমার মন; কারণ তিনি আমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া আমার দিকে বারংবার হাসিমাখান দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতেছিলেন। আমিও তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ঘোমটার ভিতর হইতে হাসিলজ্জামাখান দৃষ্টি ঘন ঘন নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলাম।

হাসিমাখান দৃষ্টি ! তোমার অসীমক্ষমতা। তুমি যুবকযুবতী দিগকে বাঁধিয়া সংসারে নিয়ত নাচাইতেছ। তুমিই কুলবতীকে কুল হইতে বাহির করিয়া আন। তুমিই যুবককে পাগল করিয়া তুল। তুমিই অপরিচিতের সহিত অপরিচিতের মিলন করিয়া দেও।

ভাই ! ঐ হাসিমাখান দৃষ্টি আমার ও ঐ অপরিচিত যুবকের হৃদয়ে হৃদয়ে যেন স্বর্ণ সোহাগার ন্যায় মিলন করিয়া দিল। এত-দিনের পর প্রণয়পাত্র পাইয়া জীবন যেন নব জীবন পাইল। এক এক বার মনে গুরুজন ও নরকাদির ভয় আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহা তাহাতে অধিকক্ষণ স্থান পাইল না। ক্রমে ক্রমে রাত্রি হইল। গৃহকার্য্য ভুলিয়া আমি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে আমি প্রথম পাপিনী। প্রথম পাপীকে প্রথমে কেহ পাপী বলিয়া জানিতে পারে না, কারণ তাহার পূর্ব্বের সাধুতা-সংস্কার সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া থাকে, সুতরাং কেহ আমাকে পাপিনী বলিয়া জানিতে পারিল না।

রাত্রি-সমাগমে অন্ধকার হইল। আমি অন্ধকার রাত্রিতেও তাঁহাকে যেন দেখিতে পাইলাম। সেইদিন হইতে খাইতে শুইতে ইত্যাদি সকল সময়ে তিনি আমার মন হইতে সরিলেন না। সেইদিন হইতে আমি তাঁহার প্রফুল্ল মুখকমল দেখিয়া প্রফুল্ল হইয়া ভাবিলাম, তাঁহাতে যেন কোন পাপ নাই, তিনি যেন কেবল পুণ্যের আবাসভূমি। সেইদিন হইতে প্রত্যহ বৈকালে তিনি উক্ত বাঁধে বেড়াইতে আসিতেন এবং আমি প্রত্যহ প্রথম দিনের প্রথামত তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। এইসময়ে সর্ব্বক্ষণ নদীর বাঁধের দিকে আমার মন পড়িয়া রহিল। বাড়ী হইতে বাহির হইলেই আমি অগ্রে নদীর বাঁধের দিকে চাই-তাম। আমার স্বামীর গৃহ পূর্ব্বদিকে ছিল। ঐ গৃহের পূর্ব্বদিকে অনেকগুলি জানালা ছিল। আমি অনেক সময় গৃহমধ্যে বসিয়া জানালা দিয়া বাঁধের দিকে চাহিয়া থাকিতাম, তাঁহাকে না দেখিতে পাইলে নির্জ্জনে কাঁদিতাম। আমার এই প্রণয়াকাঙ্ক্ষাপূর্ণ পাপশূন্য ভাব (তোমার কাছে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার মনে কোন কুভাব ছিল না) দেখিয়া স্বামী শাশুড়ী দেবর প্রভৃতি স্বামিকুলের লোক এবং প্রতি-বেশিগণ আমাকে পাপিনী বলিয়া জানিলেন। তদবধি কুলটা বলিয়া আমি সকলের নিকট তিরস্কার ও প্রহারের ভাজন হইয়াছি।

স্থিতিশীল বঙ্গসমাজকে ধন্ত। কাম ও প্রেমের বাহ্যিক লক্ষণ (যেমন আসঙ্গলিপ্সা, হাসিমাখান দৃষ্টি) যখন একপ্রকার, তখন আমার ভাবকে একবারে নিশ্চয় কামভাব জানিয়া আমাকে নিয়ত যন্ত্রণা দেয় কেন? তোমরা যখন আমার রোগের নিদান (কারণ) জান না, তখন তোমাদের ঐপ্রকার চিকিৎসায় কি ফল হইবে?

ক-নামক রোগের বহুলক্ষণ এবং খ-নামক রোগেরও বহুলক্ষণ। ক-নামক রোগের বাহ্যিক কযেকটী লক্ষণের সহিত খ-নামক রোগের বাহ্যিক কয়েকটী লক্ষণ মিলিতেছে দেখিয়া যিনি প্রকৃত ক-নামক রোগকে খ-নামক রোগ স্থির করিয়া চিকিৎসা করেন, তিনি রোগীর প্রাণনাশের হেতু হন মাত্র।

স্বামী দেবর, শাশুড়ী প্রভৃতি আমার শ্বশুরকুলের লোকগণ ঐপ্রকার চিকিৎসক। কেন বলি, তাঁহারা আমার প্রেমের কযেকটি বাহ্যিক লক্ষণের (যে কয়েকটি মাত্র বিকাশ হইয়াছে) সহিত কামের লক্ষণ মিলিয়াছে দেখিয়া আমাকে কামপরায়ণা জ্ঞানে তাঁহাদের জ্ঞাত কুপ্রবৃত্তিদমনৌষধ প্রহরাদি দ্বারা চিকিৎসা করিতেছেন। আমার যদি যথার্থ ঐ রোগ হইত, তাহা হইলেও ঐপ্রকার রোগের ঐপ্রকার চিকিৎসা করা হাতুড়ে চিকিৎসকের লক্ষণ। যাঁহারা কুইনাইন প্রয়োগ করিয়া বিষম জ্বরকে তাড়াইতে চান, তাঁহাদিগকে আমি হাতুড়ে বলিব না ত আর কি বলিব? বিষমজ্বরে কুইনাইন প্রয়োগে কুমারের হাঁড়ী পোড়ানা চুল্লীর (পনের) মত রোগীর শরীরের উপর কিযদ্দিন অগ্নি থাকে না বটে, কিন্তু ভিতরে প্রবল অগ্নি

প্রজ্বলিত হইয়া মেদ, মাংস, রক্ত, শুক্র প্রভৃতি ধ্বংস করিতে থাকে। যে চিকিৎসায় রোগের মূল কারণ ধ্বংস না হয়, তাহা চিকিৎসাই নয়। যদি আমার রোগ সমূলে উৎপাটিত না হইল, তবে তোমার চিকিৎসার প্রশংসা কি? রোগ-নিবারণের উদ্দেশ্যই চিকিৎসা। স্বামী প্রভৃতির ঐপ্রকার চিকিৎসায় রোগীর দেহ ও মন হইতে রোগ দূর হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহা দ্বারা রোগ সংক্রামক হইয়া পড়ে। তাঁহাদের জানা কর্ত্তব্য, অনেক শারীরিক রোগ যেমন সংক্রামক, কাম প্রভৃতি অনেক মানসিক রোগও সেই-প্রকার সংক্রামক। পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত শাসন প্রভৃতি ঔষধে মানসিক সংক্রামক রোগগুলি অনেককে প্রকাশ্য-রূপে আক্রমণ করিতে পারে না বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সকলকে আক্রমণ করে, কারণ ঐ সমস্ত শাসনৌষধ মান-সিক সংক্রামক রোগের ব্রহ্মাস্ত্র নয়। শুনুন, আমি একজন কুলটার ইহকালে পারিবারিক ও সামাজিক শাসন দেখিয়া ও পরকালে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত শাসন হইবে ভাবিয়া কুলটাবৃত্তি হইতে নিরস্ত হইতে পারি বটে, কিন্তু কুলটা যে ইন্দ্রিয়চরিতার্থ-তাকে (কামকার্য্যকে) সুখ জানিয়া কুলটাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, সেই মিথ্যা সুখসংস্কাররূপ কুরোগ আমার মনে আসিবেই আসিবে। কুলটার ঐহিক দণ্ড দেখিয়া যথেচ্ছাচার করিতে আমি সাহসিনী হইব না বটে কিন্তু গুপ্তভাবে সেই কল্পিত সংক্রামক সুখ-রোগকে ভোগ করিতে কখনই ছাড়িব না। তজ্জন্য বলি মানসিক সংক্রামক রোগগুলির প্রাবল্য ঐপ্রকার শাসনৌষধে অনেককে আক্রমণ করিতে পারে না বটে, কিন্তু

মূল রোগ সকলকে আক্রমণ করে, কারণ পারিবারিক সামাজিক পারলৌকিক শাসকেরা কার্য্য দ্বারা এই ঘোষণা করেন, যে চৌর্য্য কামকার্য্য অভক্ষ্যভক্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে সুখ আছে বটে, সমাজের অনিষ্ট হয় বলিয়া তাহাদের শাসন আবশ্যক। তাঁহারা রোগের মূলগুলিকে রোগ না বলিয়া ভ্রমবশতঃ স্বাস্থ্য বলেন বলিয়া ঐ রোগ সমূলে বিনষ্ট না হইয়া সর্ব্বক্ষণ জগতে বিষময় ফল প্রসব করিতেছে। যে বৃক্ষ বিষফল প্রসব করে, তাহাকে সুধাবৃক্ষ বলিয়া ঘোষণা করা অজ্ঞতার পরিচায়ক। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শাসকেরা রোগকে সুখ বলেন বলিয়া রোগ যায় না, কারণ মানব সব ছাড়িতে পারে, কিন্তু সুখ ছাড়িতে পারে না। এই জন্য শাস্ত্রকারদের, পরিবারের ও সমাজের শাসনৌষধে রোগের মূল নাশ হইতেছে না। এই জন্যই রোগতরু সময়ে সময়ে শাখা ও প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিষফল প্রসব করিতেছে।

সুহৃদ্। আপনি বলিতে পারেন "বিজ্ঞ বিজ্ঞ লোকেও কি সুখ ছাড়িতে পারেন না? অবশ্য পারেন, তবে মানবমাত্রেই সুখ ছাড়িতে পারে না এ কথা বলা অন্যায়।"

আমি বলি, কেহ কেহ (তাঁহাদের সংখ্যা খুব অল্প) কোন কোন সুখ ছাড়েন বটে, কিন্তু তাঁহারা পরিত্যক্ত সুখকে মন্দ বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে উৎকৃষ্ট সুখকে আশ্রয় করেন। উৎকৃষ্ট সুখের নিকট পরিত্যক্ত মন্দ সুখ দুঃখে পরিণত হয় বলিয়া তাঁহারা তাহা ছাড়িতে পারেন, নতুবা সুখ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে কখনই ছাড়িতে পারিতেন না। তাই বলি, কেহ কখন সুখ ছাড়িতে পারেন না।

ভাই। যাহার কার্য্য মন্দ, তাহার কারণও যে মন্দ তাহা নিশ্চয়। কুকার্য্যের প্রাবল্য যখন সমাজের মন্দ, তখন কুকার্য্যের কারণ কুপ্রবৃত্তিও মন্দ। যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্য নিবারণ করিয়া সমাজের ইষ্ট করিতে চান, কিন্তু ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে সুখ জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে আমি কুপ্রবৃত্তি ও তাহার চরিতার্থতাকে সুখ না দুঃখ ইহা পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। তাহা পরীক্ষায় অবশ্য দুঃখ বলিয়া সিদ্ধ হইবে। তাঁহারা যখন আমার কথা বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দুঃখ বলিবেন, তখন "কুপ্রবৃত্তিগুলি যে দুঃখ" এই সত্য জাগ্রত ভাবে তাঁহাদের মনে প্রতিভাত হইবে, এবং তখন তাঁহারা তৎপ্রভাবে নব জীবন পাইয়া নিদ্রিত জগৎকে জাগ্রত করিতে পারিবেন। নিজে জীবন্ত সত্য পাইয়া জীবন্ত ভাব না ধরিলে অন্য কাহাকে জীবন্ত ভাব ধারণ করাইতে পারা যায় না। মন্দাবস্থা-জনিত* চিন্তার উদ্রেকে জীবন্ত সত্য পাইয়াছি বলিয়া আমি তোমাকে তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার ইচ্ছা এই যে, আমি চিন্তালব্ধ জীবন্ত সত্যগুলিকে জগতে দিবানিশি ঘোষণা করি। অবলা স্ত্রীজাতি বলিয়া তুমি আমাকে ঘৃণা না কর আমার এই ভিক্ষা।

ভাই। তুমি বলিতে পার, আপনার কথিত জ্ঞানের বিরুদ্ধে তুমি কার্য্য করিতেছ, কারণ তুমি এই বলিলে, "এক প্রবৃত্তির বাহ্যিক কতক লক্ষণের সহিত অন্য প্রবৃত্তির বাহ্যিক কতক লক্ষণ মিলিলে অর্থাৎ কতক বাহ্যিক লক্ষণে এক হইয়া দুই-প্রকার প্রবৃত্তির পরিচয় দিলে তাহা কোন্ প্রবৃত্তি স্থির করা যায় না। প্রহারাদি পরপুরুষের সহিত প্রণয়ের জন্যও ঘটিতে

পারে, আর কুকার্য্যের জন্যও ঘটিতে পারে, তবে তোমাকে কামপরায়ণা ভাবিয়া তাঁহারা মারিলেন, ইহা কি করিয়া জানিলে?

ভাই! আমি স্বকর্ণে শুনিয়া ইহা লিখিতেছি। অনুমান-বিভ্রাটে (দুই বা ততোধিক কারণে এককার্য্য প্রসব করে বলিয়া অনুমান-বিভ্রাট ঘটে; যেমন প্রেম ও কাম এই দুই কারণে অনুরাগোৎপত্তি হয় বলিয়া অনুমান-বিভ্রাট) আমি প্রাণান্তে না দেখিয়া সিদ্ধান্ত করি না। বিভ্রাট-অনুমানের যে ফল আমি পাইয়াছি তাহা এসংসারে অন্য কেহ পাইয়াছে কি না সন্দেহ। এজন্য আমার ইচ্ছা এই যে প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া ঐ পাপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণকে জগৎ হইতে তাড়াইয়া দিই। যে কারণ একইপ্রকার কার্য্যের পরিচয় দেয়, দুই বা ততোধিক কার্য্যের পরিচয় দেয় না (যেমন পর্ব্বতে বৃষ্টি নদীতে বন্যার একমাত্র কারণ) আমি সেইপ্রকার অনুমানের সিদ্ধান্ত করিতে সকলকে অনুরোধ করি। ইহা আর কিছুই নয়, প্রত্যক্ষের ফলমাত্র, অথবা সম্পূর্ণ সত্যের একাংশোদ্ভূত বা প্রত্যক্ষের একাংশোদ্ভূত। আমি শেষে যে সমস্ত বলিলাম, সে সমস্ত দেখাইতে চেষ্টা করিব।

১ম। অনুমান প্রত্যক্ষের ফল কি না? আকাশে চন্দ্রোদয় হইলেই আমরা পৃথিবীকে শুভ্রালোকে দীপ্ত হইতে দেখি। চন্দ্রের ঈদৃশ কার্য্য ভূয়োভূয়ো প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়া জগৎকে চন্দ্রালোকে আলোকিত হইতে দেখিলেই চন্দ্রকে আকাশে না দেখিয়াও দেখিতে পাই, সুতরাং অনুমান প্রত্যক্ষের ফল ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না।

৩য়। অনুমান সত্যের একাংশোদ্ভূত কি না? আকাশে যে শুভ্র চন্দ্র উঠে, তাহা গোল। আকাশে চন্দ্র উঠিলে জগৎ শুভ্রালোকে আলোকিত হয়, এবং সমুদ্রের জল স্ফীত হয়। ইত্যাদি চন্দ্রসম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ সত্যটী প্রত্যক্ষ হয়। চন্দ্রসম্বন্ধীয় কার্য্য প্রভৃতি চন্দ্র-সত্যের অন্তর্গত। বস্তুমাত্রই এক একটী সত্য অর্থাৎ একটী বস্তুর গুণ কার্য্য ইত্যাদি। জগৎ জ্যোৎস্না-লোকে আলোকিত হওযা ঐ চন্দ্রসত্যের একাংশ। সুতরাং ঐপ্রকার অনুমান, সত্যের একাংশ ও একাংশোদ্ভূত না হইবে কেন?

৩য়। ঐ চন্দ্রসত্য আমাদের প্রত্যক্ষেরও একাংশোদ্ভূত। আমরা বহুবার তাহার সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এখন কেবল জগৎকে আলোকিত করা কার্য্য দেখিয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষের একাংশ দেখিয়া তাহাকে দেখিতে পাইতেছি। বন্ধুকে বারংবার প্রত্যক্ষ করি বলিয়া তাঁহার রব প্রত্যক্ষ করিলে এই একাংশ শ্রবণ প্রত্যক্ষ দ্বারা তাঁহাকে সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ করি, সুতরাং ঐ অনুমান সত্যের ও প্রত্যক্ষের একাংশ ও একাংশোদ্ভূত না হইবে কেন? আমি ঐপ্রকার অনুমানকে ছয়প্রকার প্রত্যক্ষের (দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শ, আস্বাদন ও মানস) মধ্যে ধরিয়া লই। অনিশ্চিত অনুমান (যেমন মেঘ দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান) কখন কখন সত্য হইলেও সর্ব্ব সময়ে সত্য হয় না। এজন্য ঐ অনুমানকে আমি প্রত্যক্ষ অনুমানের মধ্যে ধরিব না। প্রত্যক্ষ করি নাই, অথচ আপনার দর্শন বিষয় দেখিয়া যে অনুমান (যেমন পরকালের অনুমান অর্থাৎ আমরা যেস্থানে যাই সেই খানে বাসস্থান দেখি, এই দর্শন কারণে পরকাল না

দেখিযাও পবকালেব যে অনুমান) তাহাকে আমি মহাভ্রম জ্ঞান করি। এই দৃশ্যমানপ্রকৃতি ব্যতীত আমাদের জ্ঞানলাভের উপায আব কি আছে? সুতবাং আমরা পবকাল সৃষ্টি করি কোন্ হিসাবে? চন্দ্রমণ্ডলে জীব এইপ্রকৃতি জীবের মত হইবে, এই অনুমান যেরূপ ভ্রম, সেইপ্রকার ইহকাল আছে বলিয়া পবকালের অনুমানও সেইপ্রকার ভ্রম। অন্তঃপুর-চিরবদ্ধা রমণীব "পৃথিবীর সকলস্থানস্থলময়" এই অনুমান যেরূপ ভ্রম, পবকালেব অনুমানও সেইরূপ ভ্রম হইতে পারে, কারণ না দেখিয়া অনুমান করিলে ঐরূপ ভ্রম ঘটে। সুতরাং আমরা কোন বস্তু না দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিব না, এবং সিদ্ধান্ত করিতে স্বপ্নেও চেষ্টা কবিব না। যাহা দেখি নাই, আজীবন চেষ্টা করিলেও দেখিতে পাইব না, তাহা দেখাব ন্যায সিদ্ধান্ত কঁবা বাতুলতামাত্র, কিন্তু দুঃখেব বিষয় "যাহা দেখিতে পাইব না তাহাব চেষ্টা করা মিথ্যা" এই ভাব অনেকেব মনে আইসে না বলিয়া অনেককে উক্তপ্রকার বায়ু রোগ আক্রমণ কবে। নিস্ফল-চিন্তা-বায়ুবোগে (যেমন পবকাল কি? "তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল" ইত্যাদি নিস্ফল-চিন্তা-বায়ুবোগে) অনেক পণ্ডিতমণ্ডলী অক্রান্ত হইযাছিলেন। এইজন্য তাঁহারা এত চিন্তা করিয়াও জগতের ইহলোকোন্নতি (যাহা ভিন্ন অন্য উন্নতি স্বীকার করা বাতুলতা) কবিবা যাইতে পারেন নাই। বহু পণ্ডিত নিস্ফল চিন্তারূপ বায়ুরোগে আক্রান্ত হন না বলিয়া অল্পচিন্তাতেও ইহকালের সর্ব্ববিধোন্নতি সাধন করিয়াছেন ও কবিতেছেন। আমি জানি, যিনি যতপরিমাণে প্রকৃত জ্ঞান অধিকার করিয়াছেন, তিনি

ততপরিমাণে মহান্ ও তাঁহার জীবন ততপরিমাণে আলোকময়। মিলের পার্শ্বে কণাদকে, কমটের পার্শ্বে কপিলকে ইত্যাদিকে বসাইলে কাহাকে মহান্ জ্ঞান হয়? কাহার জীবন অধিক আলোকময়? যিনি মহান্ হইবেন এবং যাঁহার জীবন যত-পরিমাণে আলোকময়, তিনি ততপরিমাণে নিশ্চয় প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চা ও জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মিথ্যাকল্পনাকারীকে সুতরাং নিষ্ফল-চিন্তা-কারীকে মহান্ বলিয়া স্থির কর, তাহা হইলে, বাতুলেরা মহান্ হইতে পারে। যাঁহারা প্রকৃত মঙ্গল-চিন্তা না করেন, তাঁহারা বিশেষ চিন্তা-শীল হইলেও আমি তাঁহাদিগকে মহান্ শব্দে অভিহিত করিতে লজ্জিত হই। আমি জানি, সম্মানসূচক দেবশব্দগুলি ঈশ্বরতুল্য উপকারী ব্যক্তিদিগের জন্ম সৃষ্ট হইয়াছে, অপকারীদিগের (যাহারা আপনার জীবনের দৃষ্টান্তে বা অন্য কোন উপায়ে জগতের অপকার করে) তাহাদের জন্য নীচশব্দ সৃষ্ট হইয়াছে।

যে অনুমান-বিভ্রাটে সু আর কু আছে, (যেমন কুরোগ, কুরোগ-নিবারণের চেষ্টা করিলে রোগী ভালও হয়, এবং রোগীর মৃত্যুও ঘটে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করি, সুতরাং কুরোগা-ক্রান্ত রোগী দেখিলে যে একটা সু আর কুর অনুমান-বিভ্রাট ঘটে) সেই অনুমান-বিভ্রাটে সু অবলম্বন করা উচিত, কারণ সু (মঙ্গলাশা) থাকিতে নিশ্চেষ্ট হওয়া মহাপাপ। আমার মত এই যে, সুভাবকে কুভাব সিদ্ধান্ত করা যেমন মহাপাপ, উহা সেইপ্রকার মহাপাপ। আমার সুভাব, কুভাব সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলিয়া অর্থাৎ জগতের অনিষ্টকর বলিয়া যে কারণে

মহাপাপ বলিয়াছি, ঐপ্রকার স্থ আশা থাকিতে নিশ্চেষ্ট হওয়াকে সেই কারণে মহাপাপ বলিতেছি।

ভাই! ঈশ্বর ও পরকালাদির অনুমানসম্বন্ধে আমার মত প্যঠ করিয়া তুমি আমাকে নাস্তিকশিষ্যা ভাবিবে। আমি যখন ঈশ্বর-পরকালাদি-সম্বন্ধে কোন তর্ক উপস্থিত করি নাই, কেবল জগতের ইষ্ট ও অনিষ্টের দিকে লক্ষ্য করিয়া পত্র লিখিতেছি, তখন ত্বাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তির উহা ভাবা উচিত নয়। তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, কি কারণে আমি ঐ অনুমানের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছি।

লোকদিগকে স্বস্বপ্রকৃতি অনুসারে ও নিজ-নিজ-দর্শন-জ্ঞানানুসারে অনুমানবলে ঈশ্বর ও পরকালাদি সৃজন করিয়া পরস্পর বিতণ্ডা ও প্রাণনাশ করিতে দেখিয়া আমি ঐ অনুমানের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছি। দেখ, মুসলমানেরা স্বপ্রকৃতি অনুসারে (মুসলমান ও হিন্দু প্রভৃতির মূল প্রকৃতি এক, কিন্তু অজ্ঞানের ও শিক্ষার জন্য যে বিভিন্নতা তাহা এস্থলে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা অনাবশ্যক) ও দর্শন-জ্ঞানানুসারে একপ্রকার, হিন্দুরা স্বপ্রকৃতি ও দর্শন-জ্ঞানানুসারে আর একপ্রকার এবং খৃষ্টান প্রভৃতি অন্যান্যপ্রকার পরকালাদি সৃজন করিয়াছে। এই বিভিন্নতার কারণে অর্থাৎ ঐ অনুমানের বৈষম্যকারণে, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদি জাতির মধ্যে কত বিতণ্ডা ও হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে। যাঁহারা ঐপ্রকার অনুমান করিতে ইচ্ছুক নহেন (যেমন বৌদ্ধ প্রভৃতি প্রকৃতিবাদী) তাঁহারাও বিনা দোষে ঐপ্রকার অনুমানবাদীদের নিকট বিনা কারণে নানাপ্রকার দণ্ড পাইয়াছেন

ও পাইতেছেন। ঐপ্রকার অনুমান যাঁহারা করেন, তাঁহাদের নিস্তার নাই এবং যাঁহারা না করেন, তাঁহাদেরও নিস্তার নাই। ঐ অনুমানের অসংখ্য দোষ। পরকালাদি মানবের অজ্ঞাত বিষয় বলিয়া আমি ক্ষান্ত রহিলাম; ইহাতে ঐ অনুমান-বাদীরা আমাকে পীড়ন করেন কেন? আর আমার অনুমানের সহিত তোমার অনুমান মিলিবে না, কারণ তুমিও দেখ নাই আমিও দেখি নাই, তবে আমরা পরস্পর বিতণ্ডা ও মারামারি করি কেন? তাই বলি, ঐ অনুমানের অসংখ্য দোষ। ঐপ্রকার অনুমানবাদীরা যত উৎপীড়ন করুক, আমি সত্যপথ কখনই ছাড়িব না; কারণ সত্যই (মনের আলোক) মানবের একমাত্র সুখ এবং অসত্যই (মনের অন্ধকার) মানবের দুঃখ। মানসিক সুখ সর্ব্বসুখসার। ঐ সুখের নিকট অন্য সুখ, দুঃখ বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং ঐ সুখের আশ্রয় লইলে কোন দুঃখই আক্রমণ করিতে পারে না। আমার বিশ্বাস, জগতে যত শিক্ষার বিস্তার হইবে, তত ঐ অনুমানের প্রকোপ কমিয়া যাইবে এবং তত দেশসুলভ অজ্ঞানতার প্রভা কমিয়া যাইয়া মানবমাত্রই একপ্রকৃতি হইবে। জ্ঞানবিস্তারে যখন শিক্ষিত মুসলমান, খৃষ্টান ও হিন্দু প্রভৃতিরা একপ্রকৃতি হইতেছে তখন জ্ঞানবিস্তারে সকলে একজাতি না হইবে কেন?

বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়া বোধ হয় জ্ঞানমাত্রই অবস্থাজনিত। আমি মূর্খ স্ত্রীলোক হইয়াও মন্দ অবস্থায় পড়িয়া অর্থাৎ অনুমান-বিভ্রাটে লাঞ্ছনা পাইয়া কোন্ অনুমান ভাল, কোন্ অনুমান মন্দ ইত্যাদি বিষয় দিব্যনেত্রে দেখিয়া তোমাকে জ্ঞানীর

মত বলিতে সাহসিনী হইয়াছি। এই কারণে বলিতে ইচ্ছা হয়, জ্ঞান অবস্থা-জনিত। যিনি দুঃখের অবস্থায় পড়িয়া থাকেন, তিনি দুঃখ ও দুঃখনিবারণের জ্ঞান সুতরাং সুখজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত আমারই কাছে, তাহা তোমাকে জানান গিয়াছে, সুতরাং আর বলিতে হইবে না। বোধ হয়, যাঁহার সুখের অবস্থা, তিনিও সুখবিষয়জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। অবস্থায় থাকিয়াও জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে না কেন? আমার সুখের অবস্থা নয়, সুতরাং ঐ বিষয়ে আমি অধিক বলিতে পারিব না।

তুমি বলিতে পার, যাহার দুঃখের অবস্থা, সে কি করিয়া সুখ-জ্ঞানলাভ করিবে? সুখভুক্তোভোগী না হইলে সুখ জানিবে কি প্রকারে?

মানবের জীবনটী সুখদ্বারা নির্ম্মিত। মানব হইয়াই সুখ ভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং আপনার প্রকৃত অবস্থার বিরুদ্ধকে দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করে, এবং প্রকৃত অবস্থাতে থাকাকে সুখজ্ঞান করিয়া থাকে। দেখ, পূর্ব্বে সহজাবস্থায় অনুমান-বিভ্রাটে কষ্ট পাই নাই ও সুখভোগ করিয়াছি বলিয়া এখন অনুমান-বিভ্রাটে কষ্ট পাইয়া দুঃখ জ্ঞান করিয়াছি, সুতরাং পূর্ব্বের সহজাবস্থাকে সুখ বলিয়া জানিতেছি। মানবের সুখ-নির্ম্মিত জীবনের দিবানিশি ক্ষয় হইতেছে ও সুখ না হইলে তাহার পূরণ হয় না বলিয়া সর্ব্বক্ষণ মানব সুখ খুঁজিতেছে। এইজন্য তাহাকে দুঃখও আলিঙ্গন করিতে হইয়াছে। যাহা জীবনের সহিত মিশিয়া জীবনকে সুখ দিতেছে, তাহাকে মানব সুখ ও যাহা জীবন ক্ষয় করিতেছে, তাহাকে দুঃখ বলিয়া জানিতেছে। এই কারণে মানব, সুখ ও দুঃখ জানে। মানবের

জীবন সুখময় বলিয়া দুঃখ পাইয়া সুখ জানিতে পারে। বলা আবশ্যক সুখ-দুঃখ-জ্ঞান মানবের ভ্রম হইলেও হইতে পারে, কারণ মানবকে ভ্রম সর্ব্বক্ষণ আক্রমণ করিতে চেষ্টা করে। আমি মন্দ অবস্থায় পড়িয়া যে কয়েকটী জ্ঞানলাভ করিয়াছি, তাহা তুমি প্রচার করিবে, এই আশায় তোমার নিকট লিখিয়া পাঠাইতেছি। তুমি আমাকে মূর্খ স্ত্রীলোক বলিয়া ঘৃণা করিও না।

ভাই। দুঃখ পাইয়া আমার মনে পরোপকারিণী বৃত্তি-দেবীর উদয় হইয়াছে। বোধ হয়, উহা সকলেরই হইয়া থাকে। আশা করি, আমাকে সামান্যজ্ঞানে ঘৃণা করিয়া যেন জগদীশ্বরী পরোপকারিণী দেবীকে ঘৃণা না কর।

সুখের জন্য মন্দ অবস্থায় পড়িয়াও বিবিধ জ্ঞানসুখ লাভ করিয়া আমার বলিতে ইচ্ছা হয় যে, সকলে যেন পরোপকার-বৃত্তি বা প্রকৃতসুখান্বেষণবৃত্তিতে চালিত হয়, কারণ পরোপকার বা সুখান্বেষণ বৃত্তিদ্বয় আপনার ও জগতের সুখবৃদ্ধির ও দুঃখনিবারণের লালসায় মানবকে নানা অবস্থায় ফেলিয়া সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞান লাভ করাইয়া মানবকে স্বর্গে পৌঁছছিয়া দেয়। ঐ দুই বৃত্তি মানবের সমস্ত মঙ্গল-দায়ক জ্ঞান লাভ করাইতে পারে, জ্ঞানেই মানবের স্বর্গ। জগৎকে জানাইবার জন্য যাহার সুখ দুঃখ জানিবার উদ্দেশ্য নাই, এবং আপনার প্রকৃত সুখের জন্য ও আপনাকে প্রকৃত দুঃখের হাত হইতে এড়াইবার জন্য যাহার প্রকৃত সুখ-দুঃখের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য নাই, তাহার ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি হ্রাস হয়, সুতরাং চিন্তা-শক্তির হ্রাস

হয়। এই কারণে জ্ঞানলাভের প্রকৃতোপায় অবস্থায় পড়িয়াও সে জ্ঞানলাভ করিতে পারে না।

বাক্যের সহিত অর্থের সম্বন্ধের মত সকলপ্রকার জ্ঞানের সহিত সুখের সম্বন্ধ আছে। পরোপকার ও প্রকৃতসুখান্বেষণ বৃত্তিদ্বয় বিজ্ঞান-চিন্তকের, প্রেমিকের ,ইত্যাদি নানাবস্থায় মানবকে ফেলাইয়া বিবিধ জ্ঞান লাভ করাইয়া দেয়, সুতরাং সুখও আনিয়া দেয়। এই কারণে আমি ঐ বৃত্তিদ্বয়ের মধ্যে কোন একটি বৃত্তিতে চালিত হইতে সকলকে অনুরোধ করি। দেখ ভাই, মহাত্মা রামমোহন রায় প্রভৃতি পরোপকারবৃত্তিতে চালিত হইয়া কতপ্রকার অবস্থায় পড়িয়া কতপ্রকার জ্ঞানসুখ লাভ করিয়া মহান্ হইয়াছিলেন। দেখ, দেবগুরু বৃহস্পতি ও মহাত্মা জন্‌ষ্টুয়ার্টমিল প্রভৃতি সুখান্বেষণবৃত্তিতে চালিত হইয়া কতপ্রকার জ্ঞানসুখ লাভ করিয়া সুখী ও মহান্ হইয়াছিলেন। সুখান্বেষণবৃত্তি যে পরোপকারবৃত্তিকে আনিয়া দেয়, এবং পরোপকারবৃত্তির নাম যে সুখ, মিল তাহার প্রমাণ। সুখান্বেষণ-বৃত্তি-চালিত মিলের মানসিক সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবার সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন "যাহারা আত্মসুখের জন্য চেষ্টা ও কার্য্য করে, তাহারা কখনই সুখী হইতে পারে না, নিজের সুখের জন্য চিরকাল অন্বেষণ কর, কখনই সুখ পাইবে না, পরের দুঃখনিবারণের ও সুখবর্দ্ধনের চেষ্টা ও কার্য্য কর, সুখ আপনা হইতে আসিবে।" এই কথাতে প্রকাশ হইয়াছে আত্মসুখান্বেষণ-বৃত্তি পরোপকার-বৃত্তিকে আনিয়া দেয়, ও পরোপকারবৃত্তির অপর নাম সুখ।

পরোপকার-বৃত্তি নিজে বিজ্ঞানচর্চ্চা করে ও তাহা করিতে

অন্যকে উপদেশ দেয়, কারণ বিজ্ঞানচর্চ্চা সুখ। যাহা সুখ, পরো-পকারবৃত্তিকে তাহা অপরকে দিতে হয়। নিজে সুখাস্বাদন না করিলে অন্যকে তাহা দিতে পারে না। এই কারণে পরোপকার বৃত্তিকে বিজ্ঞানচর্চ্চা প্রভৃতি সুখ ভোগ করিতে হয়। ফলতঃ পরোপকার-বৃত্তির সহিত মানবের সমস্ত মঙ্গল পদার্থের সম্বন্ধ আছে। সুখান্বেষণ-বৃত্তিও শেষে যে পরোপকারবৃত্তিতে পরিণত হয়, মিল তাহার প্রমাণ। আমি এই সকল কারণে ঐ দুই বৃত্তির মধ্যে কোন একটী বৃত্তিতে চালিত হইতে সকলে অনু-রোধ করি।

ভাই। একদিন আমি শাশুড়ী ঠাকুরাণীর পায়ে ধরিয়া বলি-লাম, ঠাকুরাণি! আমাকে কেন যন্ত্রণা দেন? আপনি আমাকে যে পাপে পাপিনী ভাবিয়া যন্ত্রণা দিতেছেন, আমি সে পাপে পাপিনী নহি। ভাসুর স্বামী দেবর প্রভৃতি অধুনাতন লোকেরা প্রণয়-নামক ঈশ্বর জানেন, কেবল তাঁহাদের দোষ এই যে, তাঁহারা এক সু-বৃত্তির লক্ষণের সহিত অন্য কুবৃত্তির লক্ষণের সাদৃশ্য দেখিয়া পুণ্যকে পাপ জ্ঞান করিয়া আমাকে যন্ত্রণা দিতেছেন। কিন্তু শাশুড়ী ঠাকুরাণী সে কালের লোক, দাম্পত্য-প্রেম জানিবেন কি প্রকারে? সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, নিঃস্বার্থ দাম্পত্য-প্রেম যে কি পদার্থ, তাহা সেকালের লোকের জানা দূরে থাকুক, সহস্র সহস্র বার বলিলেও তাহা তাঁহারা মনে ধারণাও করিতে পারেন না। নিঃস্বার্থ প্রেমের সাধু উদ্দেশ্যে স্ত্রী পুরুষের সহিত, পুরুষ স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলে, তাঁহারা তাহাদিগকে পাপ-কার্য্য-করণো-দ্দেশে মিলিত বলিয়া স্থির করেন। যথার্থ দাম্পত্য-প্রেমে

কামের ধ্বংস হয়, শুদ্ধ কাম কেন, সমস্ত পাপই জগতের নিকট না হউক, স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের নিকট ধ্বংস হয়। আমি যাঁহার সহিত প্রণয় করিয়াছি, তাঁহার অনিষ্টচিন্তা, অনিষ্ট কার্য্য ও তৎসহ পাপবৃত্তি চরিতার্থ করিব না এবং তিনিও করিবেন না, যদি করি, তবে নিঃস্বার্থ দাম্পত্য-প্রেম হইবে না। অতএব পাপকে বলি না দিলে চলিবে না। কিন্তু সেকালের লোক দাম্পত্যের পরে প্রেম থাকিতেও দাম্পত্য-প্রেমকে পাপের আধার বলিয়া জানে, সেই জন্য আমার এত লাঞ্ছনা। সেকালের লোক দাম্পত্য-প্রেমকে কুভাব মনে করে এবং সেদিকে তাহাদের অধিক ঝুঁক এই দুই কারণে বেদান্ত-দর্শনপ্রণেতা স্বীয়-সিদ্ধান্তানুসারে কপিলের ন্যায় প্রকৃতিকে জগতের মূল না বলিয়া প্রকৃতি ও প্রকৃতির স্বামী ঈশ্বর এই দুই জনকে জগতের মূল বলিয়া প্রকৃতিকে রাধা ও প্রকৃতির স্বামী পুরুষকে কৃষ্ণ করিয়া কাব্যাকারে জঘন্যভাবে রচনা করিয়াছেন। যদি তাহারা (সেকালের লোকেরা) দাম্পত্য-প্রেমকে ভাল বলিয়া জানিত এবং সেদিকেই তাহাদিগের অধিক ঝুঁক না থাকিত, তাহা হইলে, তাঁহাকে (ব্যাসকে) এমন নীচকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইত না। তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট আপন মত প্রকাশ করিবেন বলিয়া যে নীচ উপায়াবলম্বন করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয়, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি সদুদ্দেশ্যে চালিত হইয়াও নীচ উপায় অবলম্বন করিয়া সাধারণের মহানিষ্ট করিয়াছেন ও এখন পর্য্যন্তও করিতেছেন। যতদিন না তাঁহার সদ্ভাব সকলে বুঝিবে, ততদিন তিনি মহানিষ্ট করিবেন। তাঁহার কৃষ্ণ-রাধিকা

ভারতবাসীর বিশেষতঃ অধিকাংশ বঙ্গবাসীর ঈশ্বর ও ঈশ্বরী। এই কারণে ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গবাসী তাঁহার কৃষ্ণ-রাধিকার চরিত্র রাত্রিদিন আলোচনা করিতেছে। যাত্রায়, থিয়েটরে, কীর্ত্তনে, সাধারণ গানে ইত্যাদিতে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-রাধিকার উচ্চ চরিত্র সাধারণের নেত্রে নীচভাবে প্রকাশ হইতেছে। পুরাণ, কাব্য, নাটক ইত্যাদি কত কত গ্রন্থে কৃষ্ণ-রাধিকার সাধু চরিত্র, নীচভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া বঙ্গবাসীরা অদ্যাপি অধঃপাতে যাইতেছে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, যদুনাথ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণবপদরচয়িতারা ব্যাসের উচ্চ ভাবকে জঘন্য ভাব মনে করিয়া অসংখ্য পদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের রচনায় মুগ্ধ হইয়া বঙ্গবাসীরা তাহা দিবানিশি পাঠ করিতেছে। সেই সমস্ত পদ মধুর-রাগ-রাগিণীযুক্ত হইবার কারণ দিবানিশি গায়কগণ তাহা গাইয়া সর্ব্বক্ষণ বঙ্গবাসীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া দিতেছে। তবে কেননা বঙ্গবাসীর চরিত্র কৃষ্ণ-রাধিকার আপততঃ প্রতীয়মান নীচচরিত্রের ন্যায় হইবে?

দেখা যায়, উপাস্য দেব বা দেবীর মানবীয়-চরিত্রানুসারে (মানবীয় উপাদানে যাহা গঠিত) উপাসকের চরিত্র হইয়া থাকে, ভক্তিভাজন রামচন্দ্রের মানবীয়-চরিত্রানুসারে রামোপাসকদেরও চরিত্র হয়। কুশক্তি-উপাসক শাক্তদের চরিত্র কুশক্তি কালীর ন্যায় নিষ্ঠুর হইয়া থাকে। তবে কৃষ্ণ-রাধিকার ভক্তদেরও চরিত্র জঘন্য না হইবে কেন? এই কারণেই বৈষ্ণব বৈষ্ণবী প্রভৃতি (যাহারা যথার্থ কৃষ্ণ-রাধিকার ভক্ত) সম্পূর্ণ কামদাস বা দাসী হইয়া থাকে।

সাধারণ-অপেক্ষা কবিগণ অতি উচ্চ স্তরের লোক। সে কালের কবিগণ যখন দাম্পত্য-প্রেমকে কুভাব দিয়া আঁকিয়াছেন, তখন সর্ব্বসাধারণ যে নিঃস্বার্থ দাম্পত্য-প্রেম বস্তুটি জানিত না, এবং স্ত্রী-পুরুষের মিলনকে পাপ ভাব বলিয়া জানিত, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সেকালের শিক্ষিত লোক এবং আজ কালের লোক হইয়াও যাহারা পূর্ব্ব রীতি নীতি ইত্যাদি শিক্ষায় শিক্ষিত, সুতরাং একালের হইলেও যাহারা সেকেলে লোক, তাহারা ঐ ভাবটী কল্পনায় ধারণ করিতেও পারে না। কিন্তু অতি সুখের বিষয় যে, আজ কালের শিক্ষিত লোকেরা বিশেষতঃ আধুনিক কবিরা ঐ সুন্দর পদার্থের যশোঘোষণা করিয়া যুবক-যুবতীদিগকে পূর্ব্বের দাম্পত্য-প্রেম নরক হইতে পাশ্চত্য দাম্পত্য-প্রেম স্বর্গে তুলিতেছেন; কিন্তু সেকলের রীতিনীতিজ্ঞ লোকদিগের কিছুই করিতে পারেন না; কারণ তাহারা ঐ ভাব স্বপ্নেও মনে ধারণ করিতে পারে না। শাশুড়ী ঠাকুরাণী সেকেলে লোক। আমি পাপিনী নই বলিয়া অসংখ্যবার বলিলেও তিনি কিছুতেই তাহা বুঝিলেন না। তাঁহার পদতলে বসিয়া নিঃস্বার্থ দাম্পত্য-প্রেমের গুণ গাইয়া গাইয়া আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, তথাপি তিনি শুনিয়াও বুঝিতে পারিলেন না এবং বিরক্ত হইয়া অবশেষে একদিন আমাকে পদাঘাত করিলেন।

শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে অসংখ্যবার বুঝাইলেও তিনি বুঝিলেন না দেখিয়া আমার এই জ্ঞানের উদয় হইয়াছে যে মানব-জগৎ হইতে অজ্ঞান ও কুসংস্কার তাড়াইতে হইলে অগ্রে যে অজ্ঞান, অজ্ঞান-জড়িত মানব-জীবনের স্বাধীন-চিন্তা-শক্তিকে আচ্ছন্ন

করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে মন হইতে দূরীভূত করিয়া স্বাধীনচিন্তা-শক্তির উদ্রেক করা কর্ত্তব্য। স্বাধীন-চিন্তা-শক্তির উদয় হইলে মন ক্রমশঃ মহৎ হইবে; মন মহৎ হইলে সুতরাং মহাচেতাকে মহাকথা বলিলে মহৎ মনের প্রশস্ত বিচারস্থানে, বিচার্য্য মহা-বিষয় রাখিয়া বিচার করিয়া পরীক্ষা-পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিবে। আমি যাহা বলিলাম, ইহার প্রমাণ জগতে স্বাধীন-চেতার নিকট রহিয়াছে, অন্য প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই। হায়! আমারও জীবনঘটিত ঐ জ্ঞান সর্ব্বত্র বিস্তার হইতে আমি কবে দেখিব? স্বদেশহিতৈষিবর্গ আমার এই বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন। এই জন্য আমি তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ করি যে, অগ্রে তাঁহারা শিক্ষা দ্বারা অজ্ঞান-কুসংস্কারাপন্ন মানবদিগের আচ্ছন্ন-স্বাধীন-চিন্তা-শক্তি অজ্ঞান দূরীভূত করিয়া সুতরাং তাহাদের মনের কতকাংশ প্রশস্ত করিয়া তাহাতে স্বাধীন-চিন্তা-শক্তির উদ্রেক করিয়া দিয়া তৎপরে স্বীয় স্বীয় জগতের মঙ্গলময় সত্যগুলি, যাহারা স্বাধীন-চিন্তা শক্তি পাইল, তাহাদের নিকট উপস্থিত করেন। তাহা হইলে সত্যের রাজ্য (যাহারা স্বাধীন-চিন্তা-শক্তি পাইল) তাহাদের নিকট প্রতিষ্ঠিত হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। অজ্ঞান ব্যক্তিদের নিকট মহৎ সত্যগুলি সহস্র সহস্র বৎসর স্থাপনের চেষ্টা করিলে তাহা কখনই স্থাপিত হইবে না, যদি হয়, মূর্খদের নিকট চৈতন্যের প্রেম সত্য-স্থাপনের ন্যায় কামের নাম প্রেম যেমন হইয়াছে, সেইপ্রকার হইবে, এবং চৈতন্যের প্রেমের উপাসনা না করিয়া মূর্খেরা যেমন কামের উপাসনা করিতেছে, সেইপ্রকার হইবে; অর্থাৎ মহান্ লোকদিগের মহামহাভাব

মূর্খদের নীচ-প্রবৃত্ত্যনুসারে নীচ ও মন্দ হইয়া জগতে বিরচণ করিবে।

ভাই! মন্দ অবস্থায় পড়িয়া আমি আর একটি জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাহা এই যে, আমি তুমি ইত্যাদি জন কয়েক লোক সত্য কেবল জানিতে পারিলেই, সমাজের ও আমার তোমার ইত্যাদি ব্যক্তিগত সত্যজ্ঞদের সম্পূর্ণ মঙ্গল হইবে তাহা ভাবা মহাভ্রম। প্রেম যে পবিত্র তাহা কেবল নব্যশিক্ষিতেরা জানে, সেকেলেরা জানেনা। এই কারণে আমি এক জন যুবকের সহিত প্রেম করিয়াছিলাম বলিয়া আজি আমার এত লাঞ্ছনা। তবে ব্যক্তিগত-সত্যজ্ঞানে সম্পূর্ণ মঙ্গল কোথা? উহা সকলে না জানিবার ও কামকে সুখ জানিবার কারণ আত্মহত্যা, পরহত্যা, সুরাপান প্রভৃতি অসংখ্য পাপে সমাজ যখন ধ্বংস হইতেছে, তখন সমাজের সম্পূর্ণ মঙ্গল নাই এই কথা বলা বাহুল্য। যদিও আমি শুদ্ধ প্রেম-সত্য জানিবার কারণ অনেক পরিমাণে মানসিক সুখ লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু ঐ সত্য ব্যবহার করিতে না পারায় ঐ সত্যের সম্পূর্ণ জ্যোতি উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সত্যের সম্পূর্ণ সুখ লাভ করিতে পারিতেছি না। আমি যদি সমাজকে তুচ্ছ করিয়া আমার প্রণয়পাত্রের সহিত ঐ সত্যের ব্যবহার করি, তাহা হইলে ঐ সত্যের জ্যোতি অব্যবহারের অবস্থা-পেক্ষা অধিক বিকাশ হইয়া আমাকে সুখিনী করিতে পারে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সুখিনী করিতে পারে না; কারণ সমাজ হইতে বিবিধ অস্ত্র আসিয়া আমাকে সম্পূর্ণ সুখিনী করিতে দিবে না। আমি যাহা বলিতেছি, এই সত্য আমার মত লোকদিগের উপর খাটিবে (যাহাদের ভাগ অধিকাংশ)।

তবে যে মহাত্মারা সমাজের মঙ্গলের জন্ম এবং সত্যের মর্য্যাদার জন্ম কুসমাজ অগ্রাহ্য করেন, সমাজ হইতে অসংখ্য অস্ত্র খাইয়া তাঁহাদের কিছুই করিতে পারে না। কুসমাজ যদি শেষে তাঁহাদের জীবন লইতে বাসনা করে, তাহাতে তাঁহারা ভীত হইয়া দুঃখিত হন না, এবং সমাজ তাঁহাদের জীবন লইয়াও তাঁহাদিগকে দুঃখ দিতে পারে না; কারণ সত্যের জন্ম জীবন গেল ভাবিয়া সত্যপ্রিয়েরা সুখী হয়েন এবং সত্যের জন্ম জীবন গেল এই কারণে সত্য যে যথার্থ সত্য বলিয়া সমাজে দৃঢ় হইবে এই ভাবিয়া সমাজ তাঁহাদের জীবন লইলে তাঁহাদিগকে দুঃখী করিতে পারে না, বরং অতিসুখী করে। আমার পূর্ব্বোক্ত সত্য ঐ মহাত্মা লোকদিগের উপর আধিপত্য করিতে পারিবে না, আমার মত (যাহার ভাগ অধিকাংশ, ঈশ্বর করুন, আমার মত লোক যেন জগতে না থাকে, ঐ সত্য যেন লুকাইয়া যাক্, মহাব্যক্তিদের উক্ত সত্য যেন থাকে) লোকদের উপর আধিপত্য করিবে। আমার মত অধিক লোক বলিয়া আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি যে, সমাজের বিশেষতঃ আমার মত ব্যক্তির আপনার মঙ্গলের জন্মও সত্য প্রচার করা অবশ্য করণীয় হইয়া উঠে।

ভাই! শুষ্ক কথাতে কোন সত্য প্রচার করা যায় না, স্বয়ং সত্যামোদে মোহিত হইয়া কার্য্য না করিলে ও সত্যামোদে অন্যান্য ভ্রাতাদিগকে মাতাইবার ইচ্ছায় সত্যামোদে মোহিত হৃদয়ের কথাতে সত্য প্রকাশ না করিলে সত্যপ্রচার হয় না।

এক সময় আমি সাধারণের অজ্ঞাত কোন সুমিষ্ট বস্তু পাইয়া ও তাহার কিয়দংশ খাইয়া আমোদিত হইয়াছিলাম। অজ্ঞাত

ভ্রাতাদিগকে আমি অত্যন্ত ভাল বাসিতাম, সুতরাং আমার তখন ইচ্ছা হইয়াছিল, ঐ দ্রব্য ভ্রাতাদিগকে আহার করাই। তৎপরে আমি ঐ দ্রব্যভোজনের আমোদে আমোদিত হইয়া আমোদিত প্রাণের কথায় ভ্রাতাদিগকে বলিলাম, ভাতৃগণ! ইহা উত্তম দ্রব্য, তোমরা অনুগ্রহ করিয়া পরীক্ষা কর। তাহারা আমাকে ভাই জানিয়া আমার কথা বিশ্বাস করিল এবং উহা আহার করিয়া আমোদিত হইল। এই ঘটনায় ব্যক্ত হইতেছে যে, আমি তাহাদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতাম এবং আমোদিত প্রাণের কথায় তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, তজ্জন্য তাহারা অসন্দিগ্ধচিত্তে তাহা আহার করিয়াছিল। ঠিক ঐপ্রকারে ও ঐ নিয়মে সত্য-প্রচার হয়, নতুবা যে সত্য আজীবন আস্বাদন করি নাই ও যাহা-দিগকে সত্য দিব, তাহাদিগকে ভাল বাসি নাই, কোন স্বার্থের জন্য আধুনিক স্বার্থপরায়ণ খৃষ্টধর্ম্ম বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারকদের মত শুষ্কহৃদয় হইয়া পরচর্ব্বণচর্ব্বিত ঈশ্বরপ্রেমসত্য প্রকাশের ন্যায় মৌখিক প্রকাশ করিলে সত্য প্রচার হয় না। এই কারণে বাহ্যিক জিতেন্দ্রিয় খৃষ্ট ও বৈষ্ণব শিষ্যেরাও গুরুর অনুরূপ হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবদের কথা উত্থাপন করিতে গিয়া মনে একটা কথা আসিয়া উপস্থিত হইল। কথাটা এই যে, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আবি-ষ্কারক চৈতন্য ও তাঁহার সহযোগীরা যদি আপনাদের মত সক-লকে (যাহাদিগকে শিষ্য করিবেন) মহৎকথা চিন্তা ও ধারণা করাইবার ক্ষমতা দিয়া তৎপরে আপনাদের সত্য তাহাদের নিকট প্রচার করিতেন এবং মূর্খদের নিকট সত্য প্রচার না করিতেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবধর্ম্মের এত দুর্দ্দশা হইত না,

তাহা হইলে চৈতন্য ও তাঁহার সহযোগীদের কৃষ্ণ-রাধার প্রেম (জীবাত্মার ও পরমাত্মার আধ্যাত্মিক প্রেম) মহা-পাপী নরনারীর পাশবরৃত্তির নাম হইত না এবং মূর্খেরা ঈশ্বর ও ঈশ্বরীকে পাপাসক্ত ভাবিয়া ও পাপের দণ্ড নাই ভাবিয়া পাপের স্রোত বৃদ্ধি করিত না। চৈতন্য বা তৎসহযোগীরা যদি শিষ্যদিগকে মহান্ করিয়া তাহাদের নিকট ঐ মহৎকথা প্রচাব করিয়া তাহাদিগকে আপনাদের মত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে চৈতন্য ও তৎসহযোগীরা সংসার হইতে চলিয়া যাইলেও বৈষ্ণবধর্ম্ম অক্ষত থাকিত, শুদ্ধ অক্ষত কেন, ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইত। এক বা কতিপয় জনের উপর কোন মহৎকার্য্যের ভার রাখা উচিত নয়; কারণ মানবজীবন ক্ষণভঙ্গুর। এক বা কতিপয় জনের জীবন ক্ষণভঙ্গুর হইলেও মানবসমজ ক্ষণভঙ্গুর নয়, এই কারণে মানবসমাজের উপর সত্যস্থাপকের ভার রাখা উচিত, সুতরাং এই কারণেও মানব-সমাজকে আপনাদের মত মহান্ করিতে চেষ্টা করাও উচিত। চৈতন্য ও তৎসহযোগীরা এবং শিখধর্ম্মনায়ক মহাত্মা গুরুগোবিন্দ সিংহ উহা করেন নাই বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ও শিখধর্ম্ম অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই দুই ধর্ম্ম আছে বটে, কিন্তু মৃতদেহবৎ পড়িয়া রহিয়াছে, সুতরাং আপনা হইতে গলিয়া যাইতেছে।

ভাই। তোমার যদি কোন সত্য যথার্থরূপে প্রচার ও চিরস্থায়ী করিতে এবং সত্যাবলম্বীদিগকে তাহার ফল ভোগ করাইতে ইচ্ছা থাকে, তবে সকলকে বা যাহাদিগকে সত্য দিবে তাহাদিগকে আপনার মত উন্নত করিয়া তুল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,

সুখ, প্রকৃত দুঃখ হইত ও প্রকৃত ভাল, প্রকৃত মন্দ হইয়া যাইত এবং যদি ভাল, মন্দ, সুখ ও দুঃখ বলিয়া প্রকৃত কোন বস্তু না থাকিত, তাহা হইলে পাপিষ্ঠ দানববংশে পুণ্যাত্মা প্রহ্লাদের ও পাপিষ্ঠ ইহুদিবংশে পুণ্যস্বরূপ যীশুখৃষ্টের আবির্ভাব হইত না। কেবল সংস্কার বশতঃ সুখ, দুঃখ, ভাল, মন্দ যদি হয়, তাহা হইলে, তাঁহাদের অস্তপ্রকার উৎকৃষ্ট গুণ কোথা হইতে আসিল বা ঐ পাপীদের সুখ, দুঃখ, ভাল, মন্দ তাঁহাদের কেন হইল না? তাঁহারা কাহাদের নিকট সংস্কার পাইয়া ভাল, মন্দ, সুখ, দুঃখ জানিলেন? এতদুত্তরে অবশ্য বলিতে হইবে, সুখ, দুঃখ, ভাল, মন্দ আত্মা হইতে উদ্ভূত হয়; সংস্কারে বা অভ্যাসে ইহাদের কখন কোন পরিবর্ত্তন হয় না; যদি হইত, তবে তাঁহাদের কেন হইল না, এবং চিরপিঞ্জরবদ্ধ পাখী ও চিরপরাধীন জাতি স্বাধীনতার জন্য কেন উৎসুক হইত? প্রকৃত মন্দ যদি অভ্যাসে প্রকৃত ভাল হইয়া যাইত, তাহা হইলে বুদ্ধদেব অধিক বয়সে সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন না। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলা অনাবশ্যক। তোমার ঐ কথা যে অসার তাহা খৃষ্ট, প্রহ্লাদ ও শাক্যসিংহ সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

আমি বলি, এক নিয়মে এক সত্য সর্ব্ব সময়ে আবদ্ধ নহে, এই কথা এক সুখসত্যের নিকট প্রমাণিত হইতেছে। দেখ, এমন কতকগুলি সুখ (যেমন ভোগসুখ) আছে, নিত্য অভ্যাসে তাহাদের অনুভব হয় না; নিত্য পায়সান্ন খাইয়া কে কবে সুখী হয়? আবার এমন কতকগুলি সুখ আছে, যাহা অভ্যাসে স্থায়ী হয়, অনভ্যাসে পলাইয়া যায় (যেমন শাস্ত্রচর্চ্চা, পরোপকার প্রভৃতি)। ঐপ্রকার সুখসত্য ব্যবহার কর, দুঃখ হইবে

না। আমি ঐপ্রকার সুখসত্যের মত সত্যকে অপরিবর্ত্তনীয় বলিতেছি এবং ঐপ্রকার সত্যকে আমি প্রকৃত সত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। ভোগসুখ প্রভৃতি সত্যকে (যাহা নিত্য ব্যবহারে দুঃখে পরিণত হয়) আমি প্রকৃত সত্য বলিতে পারি না। তুমি ঐপ্রকার সত্য দেখিয়া ঐপ্রকার সব সত্য অনুমান করিয়া যদি তর্ক কর, তবে তুমি ভ্রমে পড়িবে। যাহা ক্ষণেক মিথ্যা, ক্ষণেক সত্য, ক্ষণেক সুখ, ক্ষণেক দুঃখ, তাহাকে মূল ভাবিয়া তর্ক করা অবিবেচকের কার্য্য, তথাচ আমি উহাদিগকে জগৎ হইতে তুলিয়া দিতে ইচ্ছুক নই; কারণ সুখমাত্রকেই জগতে রাখা কর্ত্তব্য। যে সুখ অভ্যাসে দুঃখ হয়, তাহাকে সময়ে সময়ে ভোগ কর, কখনই তাহা দুঃখ বোধ হইবে না।

সুহৃদ্‌বর। আর একটি কথা শুনুন, বহু ভৎর্সনা ও প্রহারের পর শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর প্রেরিতা একজন শিক্ষিতা রমণী আমাকে একদিন নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন, ভগিনি। তুমি কেন পাপপথে যাইতেছ?

আমি। পাপশূন্য দাম্পত্য-প্রেমটীও কি পাপ?

শিক্ষিতা। তাহাতেও পরস্পর পরস্পরের নিকট ভালবাসা-সুখ পাইবার আশা আছে, সুখের আশায় কার্য্য করাই পাপ। সুখের কামনা ছাড়িয়া সৎকার্য্য কর এবং কার্য্যের ফল ঈশ্বরকে অর্পণ কর।

শিক্ষিতার নিকট এই কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। সেই সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, সুখের আশা ভিন্ন আমাদের জীবন কোন কার্য্যেই

প্রবৃত্ত হয় না। আমাদের যাহা জীবন, তাহার আহারীয় বস্তু একমাত্র সুখ। যিনি যে বস্তু আহার করেন, তিনি সেই বস্তুর রূপান্তরমাত্র। সুতরাং জীবনের অপর নাম সুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। নিষ্কামধর্ম্মে আমাদের প্রকৃত সুখ লাভ হয় বলিয়া আমাদের জীবন তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, নতুবা কখনই হইত না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক সত্য সর্ব্বসময়ে এক নিয়মে আবদ্ধ নয়, এইজন্য কতকগুলি সুখ আশা না করিলে পাওয়া যায় না, আবার কতকগুলি সুখ আশা না করিয়া পাওয়া যায়, পরোপকার-কার্য্যে বাহ্যিকে সুখের আশা করিলে সুখ পাওয়া যায় না এবং সুখের আশা না করিলে প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়। এই কারণে আমাদের জীবন পরোপকার প্রভৃতি নিষ্কাম কার্য্যে সুখের আশা না করিয়া প্রবৃত্ত হয়। নিষ্কাম কার্য্যেও যখন জীবন সুখ ভিন্ন প্রবৃত্ত হয় না, তখন এমন কোন কার্য্য নাই যাহাতে জীবন সুখ ভিন্ন প্রবৃত্ত হয়, এবং কোন কার্য্যকেই প্রকৃত নিষ্কাম বলিতে পারা যায় না। বাহ্যে বা অন্তরে যখন কার্য্যমাত্রেই সুখের আশা থাকে, তখন কি করিয়া কোন কার্য্য নিষ্কাম হইতে পারে? নিষ্কাম কথাটা তাহা হইলে "শশকের শিং" এই কথার ন্যায় অর্থশূন্য হইয়া পড়ে।

কার্য্যের ফল সুখ ভিন্ন জীবন যখন তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না, এবং সুখভোগ না করিয়া থাকিতে পারে না, তখন ঈশ্বরকে দেওয়া কথাটা মিথ্যা যোজনা করিয়া তাহার আলোচনা করা বৃথা। যাহার জীবনে বাহ্যিক ও আন্তরিক সুখের আশা নাই, সুতরাং সুখ নাই, সেই সুখশূন্য শুষ্ক জীবনকে ধার্ম্মিকের জীবন বলিয়া

ঘোষণা করা নিতান্ত অধার্ম্মিকের কার্য্য। যাহা জগতের অনিষ্টকর তাহাকে, মূর্খ আমি কেন, জ্ঞানিমাত্রেই পাপ বলিয়া ঘোষণা করেন। আমি ঐপ্রকার সুখশূন্য জীবনকে পাপজীবন না বলিয়া থাকিতে পারি না। আমি নিশ্চয় জানি, যাঁহারা নিষ্কামধর্ম্মের চিত্র আঁকিয়া জগতে নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রচার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাঁহারা সুকামনা- (বাহ্যিক সুখাশাহীন কামনা) পূর্ণ সুন্দর জীবন দেখিয়া মোহিত হইয়া তাহাকেই নিষ্কামজীবনচিত্র আঁকিয়াছেন। সরসতাপূর্ণ সৌন্দর্য্যই লোকের মোহিত হইবার কারণ। তাঁহারা যখন নিষ্কাম জীবন দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন, তখন নিষ্কাম জীবন নিশ্চয় সরসতাপূর্ণ সৌন্দর্য্য, সরসতার কারণ শান্তিপূর্ণতা, শান্তি-পূর্ণতাই সুখপূর্ণতা, সুতরাং নিষ্কাম জীবন যে সুখপূর্ণ তাহা নিশ্চয়। আমার বিশ্বাস, সুখশূন্য-জীবন-চিত্র পর-হিতৈষীরা আঁকিতে পারেন না, কারণ তাঁহাদের কার্য্য অন্যকে সুখ দেওয়া ; সুতরাং নিষ্কাম জীবন যে সুখময়, উহাকে বিশ্বপ্রেমকেরা যখন আঁকেন, ও সকলকে নিষ্কামধর্ম্মাবলম্বী হইতে যখন উপদেশ দেন, তখন উহা যে নিশ্চয় সুখ এই কারণেও স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। ভাই! তুমি বিরক্ত হইবে বলিয়া অদ্য আমি বিদায় লইলাম, বারান্তরে অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

তোমার

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দেবী।

প্রকাশক — শ্রীপ্রিয়নাথ দাস
জেলা মেদিনীপুর, পায়রাশিগ্রাম।

প্রিণ্টর—শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ৫৬ নং